মডিউল-২৪ ঃ
দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য

২৪.১ দুধের মান ও পরিমাণ কম-বেশী হওয়ার কারণ

দুধ উৎপাদন হল একটি বড় ধরনের প্রক্রিয়া যেখানে অনেক বিষয় জড়িত। এখানে প্রাণির নিজেস্ব বৈশিষ্ট্য ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুধের মান ও পরিমাণ কম-বেশী হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হল।

২৪.১.১ প্রাণির নিজেস্ব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে দুধের মান ও পরিমাণ কম-বেশী হওয়ার কারণ

১। প্রাণির জাত ঃ গাভীর দুগ্ধমান ও পরিমাণ উভয়ই জাতের উপর নির্ভর করে। গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ এবং দুধের উপাদান যেমন- চর্বি, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি বিভিন্ন জাতের প্রাণিতে কম বেশী হয়। উচ্চ উৎপাদনশীল প্রাণি থেকে দুধ উৎপাদন বেশী পাওয়া যায় । যেমন- হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, জার্সি, ব্রাউন সুইস,গুয়েরেন্সি, শাহীওয়াল, সিন্ধি । অন্যদিকে দেশী জাতের প্রাণির দুধ উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কম। দুধের মান ও পরিমাণ দুটো বিপরীত জিনিস। দুধের পরিমাণ বেশী হলে চর্বির পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই কম হয়ে যায়। এজন্য আমাদের দেশী প্রাণিতে চর্বির পরিমাণ বেশী।

২। বংশ ও বয়স ঃ একই জাতের প্রাণির বংশ ও বয়স ভেদে দুধের মান ও পরিমাণ কমবেশী হয়। গাভী **১**ম বিয়ানে কম দুধ দেয় । ধীরে ধীরে ৫ম বিয়ানের সময় পর্যন্ত গাভী বেশী দুধ দেয় ও চর্বির পরিমাণ বাড়তে থাকে। তারপর থেকে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও দুধে চর্বির পারমাণ কমতে থাকে।

৩। প্রাণির উৎপাদন ক্ষমতা ও সংখ্যা ঃ নির্বাচিত প্রাণির উৎপাদন ক্ষমতা বেশী হলে ও প্রাণির সংখ্যা বেশী হলে বেশী পরিমাণ দুধ পাওয়া যাবে।

৪। প্রাণির শারীরিক অবস্থা ঃ গাভীর শারীরিক অবস্থা বিশেষ করে গর্ভকালে ও প্রসবকালে সুস্বাস্থ্য আশানুরূপ দুধ উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গাভী হতে বেশী দুধ পেতে হলে গর্ভকালে সুষ্ঠু পরিচর্যা ও সুষম খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন।

৫। প্রাণির আকার ঃ একই জাতের ছোট আকারের গাভী থেকে বড় আকারের গাভী হতে বেশী দুধ পাওয়া যায়।

৬। প্রাণির ওলান ও বাঁটের অবস্থা ঃ দুগ্ধজাত প্রাণির ওলান ও বাঁটের অবস্থা যত ভাল হবে দুধ উৎপাদন তত বেশী হবে। সাধারণতঃ গাভীর মোট দুধ উৎপাদনের ৪০% ওলানের সম্মুখের অংশের বাঁট এবং ৬০% পিছনের অংশের বাঁট থেকে পাওয়া যায়। এজন্য রোগমুক্ত ওলান ও বাঁটের আকারের উপর দুধের মান ও পরিমাণ নির্ভর করে।

৭। প্রাণির অভ্যন্তরীণ অবস্থা ঃ প্রাণির শরীরে অভ্যন্তরীণ কোন সমস্যা যাতে না থাকে। বিশেষ করে হরমোন জাতীয়, প্রাণির গরম না হওয়া বা অন্য কোন সমস্যা ইত্যাদি। গাভী সমস্যামুক্ত না হলে ভাল দুধ উৎপাদন সম্ভব নয়।

৮। গর্ভবস্থা ঃ পাঁচ মাস গর্ভবতী গাভী দুগ্ধ প্রদানে উলেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। এ সময় দুধের পরিমাণ কমে যায়।

৯। প্রাণির রোগ ঃ সব রোগই দুধের মান ও পরিমাণ কমায়। তবে ম্যাসটাইটিস বা ওলান প্রদাহ সবচেয়ে বেশী দুধ উৎপাদন কমায় ও গুণগত মান নষ্ট করে দেয়। এজন্য ওলান প্রদাহযুক্ত গাভীও দুধ উৎপাদনের সাথে জড়িত।

২৪.১.২ সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুধের মান ও পরিমাণ কম-বেশী হওয়ার কারণ

১। প্রাণিখাদ্য ঃ খাদ্য দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও মানের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। অর্থাৎ যত ভাল খাবে তত বেশী উৎপাদন দিবে। গাভীকে সুষম খাদ্য না দিলে দুধ উৎপাদন কমে যায় আবার অতিরিক্ত দানাদার খাদ্য, বড়ি জাতীয় খাদ্য, বেশী রসালো খাদ্য ও ঘাস, মিহিভাবে গুঁড়া হে ইত্যাদি দুধের চর্বির পরিমাণ কমিয়ে দেয়। দুধে খনিজ পদার্থ ও ভিটামিনের পরিমাণ গাভীর খাদ্য দ্বারা বাড়ানো যায়। গাভীকে সুষম খাদ্য না দিলে আমিষ ও শর্করা জাতীয় উপাদান ও দুধ উৎপাদন কমে যায়।

২। ব্যবস্থাপনা ঃ দুধ উৎপাদনের সাফল্য নির্ভর করে প্রাণির সার্বিক ব্যবস্থাপনার উপর। কারণ ভাল জাতের প্রাণি হলেও ভাল বাসস্থান ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, ক্রটিপূর্ণ দুধ দোহন, রোগ ইত্যাদি উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

৩। দুধ দোহন পদ্ধতি ঃ দুধের মান ও পরিমাণ দুধ দোহন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। কম উৎপাদনশীল বা দেশী প্রাণি থেকে সহজেই হাতের সাহায্যে দুধ দোহন করা যায়। কিন্তু অধিক উৎপাদনশীল প্রাণির জন্য মেশিনের সাহায্যে দুধ দোহনের প্রয়োজন পড়ে এবং দোহনের সময় দুধ যেন দূষিত না হয় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

৪। দোহন কাল ঃ দোহন কালের ১ম ৫০ দিন দুধ উৎপাদন বেশী থাকে ও পরে আস্তে আস্তে কমে যায়। ৯০ দিন পর দুধে চর্বির হার বৃদ্ধি পায় এবং আমিষের হার আংশিক বৃদ্ধি পায়।

৫। দুধ ছাড়ান কাল ঃ প্রসবের পূর্বে কমপক্ষে ২ মাস ওলানের ক্ষত পূরণের জন্য প্রয়োজন। গাভী **১২-১৩** মাস দুগ্ধহীন অবস্থায় থাকলে উৎপাদন বেশী হয়।

৬। দোহনের হার ও সময় ঃ দিনে ২-৩ বার দুধ দোহন করলে দুধ উৎপাদন বেশী পাওয়া যায়। কারণ ওলানের দুগ্ধ ধারণ ক্ষমতা সীমিত। দোহনের পরেই সর্বাধিক দুগ্ধক্ষরণ হয়। ওলানের দুধের চাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে দুগ্ধক্ষরণ কমতে থাকে। দোহনের মধ্যবর্তী সময় বেশী হলে দুধের পরিমাণ বেড়ে যায় কিন্তু চর্বির পরিমাণ কমে যায়। সময় হিসাব করে দুধ দোহন করলে দুধ উৎপাদন বেশী হয়। প্রতিদিন একই সময়ে একইভাবে দোহন করা উচিত। সাধারণতঃ সকালে দুধের উৎপাদন বেশী হয় ও বিকালে চর্বির পরিমাণ বেশি থাকে।

৭। দুধ পূর্ণ দোহন ও দোহনকারী ঃ দুধ সব সময় পূর্ণভাবে দোহন করতে হবে। নতুবা উৎপাদন কম হবে এবং চর্বির পরিমাণও কম হবে। কারণ চর্বি দোহনের শেষের দিকে বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। একই ব্যক্তি দুধ দোহন করলে গাভী ভদ্র আচরণ করে ও দুধ উৎপাদন বেশি হয়।

৮। এস্ট্রাস সাইকেল ঃ যেহেতু দুধ উৎপাদনের জন্য দায়ী ল্যাকটোজেনিক হরমোন গাভীর এস্ট্রাস সাইকেলে অংশ নেয়। যেহেতু এ সময় গাভীর উৎপাদন উলেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

৯। বাচ্চা প্রদানের ব্যবধান ঃ দীর্ঘবিরতী দিয়ে গাভী বাচ্চা দিলে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

১০। পানির প্রভাব ঃ গাভীকে দিনে একবার পানি খাওয়ালে যে পরিমাণ দুধ পাওয়া যায়,ইচ্ছা মত পানি ক্ষেতে দিলে ৩.৫% বেশি দুধ পাওয়া যায়।

১১। প্রাণির প্রজনন ও ছাটাই ঃ দেশী জাতের প্রাণি থেকে যেহেতু দুধ উৎপাদন কম পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে আপগ্রেডিং প্রজনন পদ্ধতিতে প্রাণির প্রজনন ঘটাতে হবে। তাহলে দুধ উৎপাদন বেশি হবে। কম উৎপাদনশীল ও অসুস্থ গাভী বাদ দিয়ে নতুন ভাল গাভী প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বাড়ানো যায়।

১২। ঋতু ও আবহাওয়া ঃ শীত মৌসুমে দুধের পরিমাণ ও চর্বির অংশ বেশী হয়। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় দুধের পরিমাণ ও মান হ্রাস পায় । ৮৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ও ৬০% আর্দ্রতা গাভীর জন্য সংকটময় তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বলা হয়।

২৪.২.১ বিশুদ্ধ দুধ দোহনের নিয়ামাবলী

প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ 'আদর্শ খাদ্য' দুধ। কিন্তু এ দুধ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে অতি সহজে দূষিত হয়ে পড়ে। দুধ দোহন পদ্ধতিই এর প্রধান কারণ এবং দোহনের সময়ই অসংখ্য ক্ষতিকর জীবাণু দুধে ঢুকে পড়ে। দুধে জীবাণু এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে দুধের পুষ্টিমান অতি সহজেই নষ্ট করে ফেলে। তাই দুধ দোহনের সময় যত বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা যায় তত ভাল দুধ পাওয়া যায়।

১. দোহনের পূর্বে গাভীকে ভাল করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। গাভীর পশ্চাৎভাগ, ওলান, বাঁট, লেজ, মলদ্বারের চারপাশে ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং শুকনো পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে ফেলতে হবে। শীতকালে সামান্য গরম পানি ব্যবহার করতে হবে।
২. দুধ দোহনের পূর্বেই গাভীর শরীরকে ব্রাশ করে আলগা পশম সরিয়ে ফেলতে হবে।
৩. গোয়ালা বা দুধ দাহনকারীকে অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। গোয়ালার হাত বা শরীরের অন্যস্থানে যেন কোন চর্মরোগ না থাকে এবং হাতের নখ ও আঙ্গুল সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে।
৪. দোহনের পাত্র অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত হতে হবে। এ জন্য আগে থেকেই ফুটন্ত পানি দিয়ে দুগ্ধ পাত্র পরিষ্কার করে শুকিয়ে রাখতে হবে।
৫. যেখানে অনেক গাভী দোহন করতে হবে, সেক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের (stainless Steel) স্টেইনলেস্ স্টীলের তৈরি দুধ দোহন পাত্র করা বাঞ্ছনীয়। ঐ দুধ দোহন-পাত্রের (Milking pail) ভিতর মসৃণ হওয়া উচিত এবং তার মুখ উপরিভাগের এক পার্শ্বে ঢাকা থাকতে হবে।

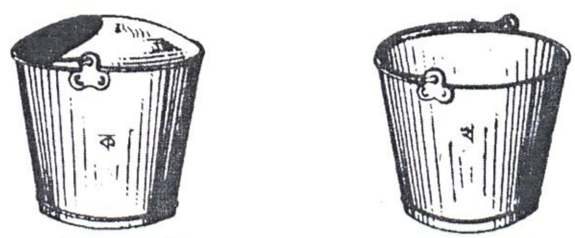

চিত্র ২৪.১ ঃ ক আংশিক খোল আদর্শ বালতি
খ সম্পূর্ণ খোলা দুধ দোহাবার বালতি।

৬. বিকল্প হিসেবে ভিন্ন ধরনের দুধ দোহন পাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে, যা গরম পানি দিয়ে সহজে পরিষ্কার করা যায়।
৭. দুধ দোহনের স্থান সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে।
৮. গাভী দোহনের সময় গাভীকে যেন কুকুর বা অন্য কোন প্রাণী বা মানুষ উত্যক্ত করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট জায়গায়, নির্দিষ্ট লোক দিয়ে নির্দিষ্ট পাত্রে দুধ দোহন করতে হবে। এ ব্যবস্থায় গাভী খুব সহজে তাড়াতাড়ি দুধ ছেড়ে দেবে; সময়, পাত্র, স্থান ও লোকের আগমন সম্বন্ধে পরিচিত থাকবে তার ফলে দুধ দোহন সহজ ও পরিপূর্ণ হবে।
১০. দোহনকারী দুধ দোহনের সময় যেন হাঁচি, কাশি না দেয় সে ব্যাপারে পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ রোগাক্রান্ত কোন লোক দিয়ে দুধ দোহন না করানো উচিত।
১১. দুধ দোহন শুরু হওয়ার পূর্ব মূহুর্তে বাছুর গাভীর প্রতিটা বাঁটে মুখ দিয়ে সামান্য কিছু দুধ যেন চেটে নেয়। এর ফলে বাঁটে যদি কোন জীবাণু থেকে থাকে তা অপসারিত হবে।
১২. যখন বাছুর থাকবে না তখন বাঁট হতে সামান্য পরিমাণ দুধ অন্য একটা পাত্রে বা কাপে সরিয়ে রাখা ভাল। এতে দুধ জীবাণুমুক্ত হতে পারে।

১৩. অনেকেই দুধ দিয়ে হাত ভিজিয়ে বাঁট পিচ্ছিল করার অভ্যাস আছে। এর ফলে প্রচুর জীবাণু দুধে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই এ অভ্যাস অবশ্যই ত্যাগ করা উচিত।
১৪. বাঁটকে মৃদুভাবে আঙ্গুল দিয়ে মর্দন করে নরম করে নিলে বাঁট শুকনো থাকলেও দুধ দোহন করা যায়। এর ফলে দুধে জীবাণু প্রবেশের সম্ভাবনা কম থাকে।
১৫. যদি বাঁট বড় হয় তবে বাঁটকে মুঠে করে বার বার সংকোচন করলেও দুধ দোহন সহজ হয়।
১৬. দুধ যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি দোহন শেষ করাই উত্তম। নতুবা বেশি সময় নিলে সম্পূর্ণ দুধ দোহনের পূর্বেই ওলানে কিছু দুধ আটকে থাকতে পারে। অথবা গাভী দুধ উঠিয়ে নিবে। দোহনের শেষ পর্যায়ে দুধে ননীর ভাগ বেশি থাকে। সুতরাং এভাবে সর্বোকৃষ্ট দুধের অংশ বিশেষ ওলানে থেকে যাবার সম্ভাবনা থাকে।
১৭. দুধ দোহনের পরপরই দুধকে ঠান্ডা করে নিতে হবে। হিমায়িত করার ব্যবস্থা থাকলে হিমায়িত করা উত্তম। তবে দুধকে পাস্তুরিত করতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়।

২৪.২.২ দুধ দোহন পদ্ধতি

দুধ দোহন হল দুধ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্পূর্ণ বিষয়। দুধ দোহন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দুগ্ধগ্রন্থি হতে দুধ নিঃসরণ করা হয়, যা হাত দ্বারা অথবা মেশিনের সাহায্যে করা যায়। হাত দ্বারা দুধ দোহন তিনভাবে হতে পারে- (ক) পূর্ণ হস্ত দোহন (খ) নোড দ্বারা দোহন (গ) দুই আঙ্গুল দ্বারা দোহন

পদ্ধতিসমূহের বর্ণনা

(১) হাত দ্বারা দুধ দোহন (Hand milking)

মূলনীতি ঃ হাতের সাহায্যে দুধের বাঁটের উপর চাপ প্রয়োগ করলে ওলানের ভিতরের দুধের উপর চাপ পড়ে। যখন চাপ অপসারণ করা হয় তখন ওলানের দুধ বাঁটে চলে আসে। আবার যখন বাঁটে চাপ দেয়া হয় তখন একই সাথে দুধ নিচের পাত্রে জমা হয় এবং ওলানের ভিতরও চাপ পড়ে। এভাবে দুধ দোহন প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

(ক) পূর্ণ হস্ত দোহন ঃ যে সমস্ত গাভীর ওলানের গঠন ভাল এবং এবং বাঁটগুলি পরিমিত আকারের ধরা হয় যাতে ছোট আঙ্গুলের অগ্রভাগ মুক্ত থাকে। এভাবে বাঁট ধরে বার বার মুঠো খোলা এবং বন্ধের মাধ্যমে দুধ দোহন করতে হয়।

(খ) নোড দ্বারা দোহন ঃ যে সমস্ত গাভীর বাঁট মোটা ও মাংসল, সে সমস্ত গাভী দোহনের জন্য এ পদ্ধতি উপযুক্ত। এ পদ্ধতিতে বৃদ্ধাঙ্গুলির অর্ধভাগ এবং প্রথম আঙ্গুল দ্বারা বাঁটকে এমনভাবে ধরা হয় যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়ে বাঁটে চাপ প্রয়োগ করা যায়। এভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বার বার চাপ প্রয়োগ করার মাধ্যমে দুধ দোহন করতে হয়।

(গ) দুই অঙ্গুল দ্বারা দোহন ঃ যে সমস্ত গাভীর বাঁট ছোট, সে সমস্ত গাভী এ পদ্ধতিতে দোহনের জন্য উপযুক্ত। এ পদ্ধতিতে বৃদ্ধাঙ্গুল এবং প্রথম আঙ্গুল এর অগ্রভাগ দিয়ে বাঁট ধরা হয়। দু আঙ্গুল দিয়ে চাপ প্রয়োগসহ উপরে-নিচে করে দুধ দোহন করতে হয়।

২৪.৩.১ তরল দুধ সংরক্ষণ

দুধ একটি অতি সংবেদনশীল খাদ্য। সাধারণতঃ দুধ দোহনের অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবহার না করলে দুধ সহজে নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য দুধ সংরক্ষণের প্রয়োজন পড়ে।
দুধ সংরক্ষণ হল একটি প্রক্রিয়া যেখানে দুধকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত পচনমুক্ত রেখে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার উপযোগী রাখা হয়।

দুধ সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃদুধকে বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করা যায়। তবে দুধ সংরক্ষণ ব্যবস্থা তেমন সহজ নয়। কারণ দুধের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন খুব সহজেই ঘটে। সেজন্য দুধ দোহনের পরপরই দুধকে ছাঁকতে ও ঠান্ডা করতে হয়।

(১) ঠান্ডা প্রক্রিয়া

(ক) ডিপফ্রিজ ঃ দুধকে ডিপফ্রিজে রাখলে জমে যায় এবং সংরক্ষণ করা যায়। তবে এক্ষেত্রে দুধে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি না ঘটলেও রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন হয় এবং গুণগতমান কমে যায়।

(খ) হিমশীতল ট্যাংক ঃ দুধকে হিমশীতল ট্যাংকে রেখে কয়েক ঘন্টা সংরক্ষণ করা যায়। এক্ষেত্রে ধীরে ধীরে দুধের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন হতে থাকে।

(২) গরম প্রক্রিয়া

সাধারণ তাপমাত্রায় বিভিন্ন জীবাণু দুধে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্নের মাধ্যমে দুধকে টক স্বাদযুক্ত করে ফেলে। স্ট্রেপটোকক্কাই (Streptococci) নামক ব্যাকটেরিয়া জীবাণু প্রধানত দুধে অ্যাসিড তৈরি করে। ব্যাকটেরিয়া জীবাণু সাধারণ তাপমাত্রায় দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। তাই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে দীর্ঘ সময় দুধ সংরক্ষণ করা যায়।

(ক) দুধ ফুটানো ঃ দুধকে ফুটালে ৭-৮ ঘন্টা সংরক্ষণ করা যায়।

(খ) দুধকে ৪ ঘন্টা পরপর ২০ মিনিট করে ফুটানো এভাবে দুধ ফুটালে দুধ জীবাণুমুক্ত হয় এবং সংরক্ষণ করা যায়।

(গ) উচ্চ তাপমাত্রায় প্রক্রিয়াজাতকরণ (পাস্তুরাইজেশন, স্টেরিলাইজেশন)।

(৩) গুঁড়াদুধ ঃ দুধকে মেশিনের সাহায্যে শুকিয়ে গুঁড়া দুধ তৈরি করে অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে দুধের গুণাগুণ কিছুটা নষ্ট হয়ে যায়।

(৪) দুধ থেকে বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য বানানো ঃ দুধের সঙ্গে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে দুধকে সংরক্ষণ করা যায়। যেমন হাইড্রোজেন পার অক্সাইড, সোডিয়াম বাই কার্বনেট, ল্যাকটো পার অক্সিডেজ ইত্যাদি। ০.০৫% হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দুধে মিশিয়ে দিলে দুধ ১৫-১৬ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়, দুধ ফুটালে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড নষ্ট হয়ে যায়।

২৪.৩.২ দুধ পরিবহন ও বিপণন

দুধের চাহিদা মিটাতে এবং দুধকে প্রক্রিয়াতাজকরণের উদ্দেশ্যে দুধের পরিবহন করার প্রয়োজন পড়ে। দুধ পরিবহন হল দুধকে উৎপাদনের জায়গা থেকে সরাসরি ভোগের জায়গা বা প্রক্রিয়াজাতকরণের জায়গায় নেওয়ার পর ভোগের জায়গায় পৌঁছানো। দুইভাবে দুধকে পরিবহন করা যেতে পারে। মিল্ক ক্যানের সাহায্যে ও ট্রাক ট্যাংকের সাহায্যে ।যেহেতু দুধ একটি শ্রেষ্ঠ আদর্শ খাদ্য সেহেতু তার চাহিদাও অনেক। তাই তার সুষ্ঠু বিপণনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুধ বিপণনের চ্যানেল দেখানো হল ঃ

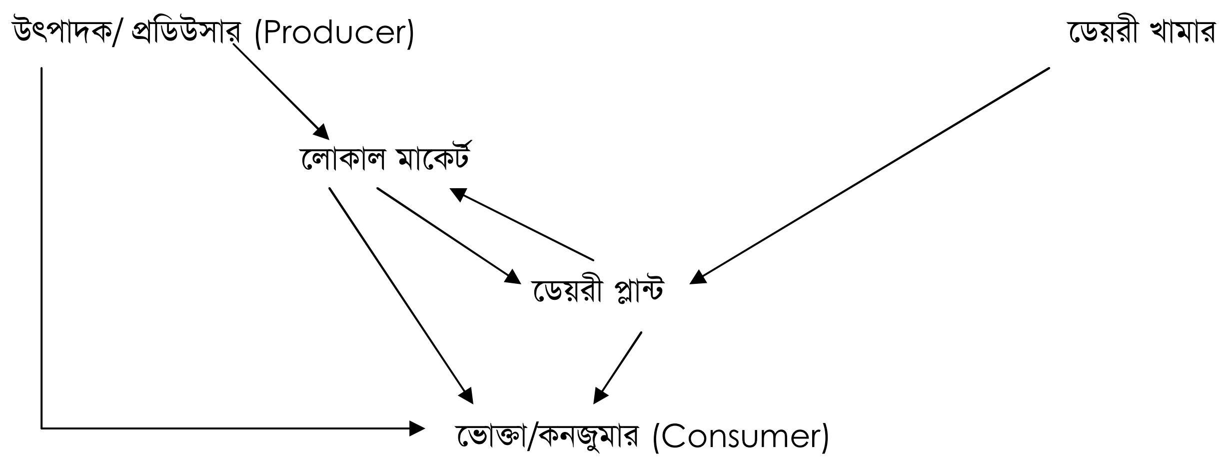

চিত্রঃ ২৪.২.দুধ বিপণন চ্যানেল

দুধ বিপণনের সমস্যা

১. স্বাস্থ্যসম্মত দুধ সম্পর্কে জনসাধারণের জ্ঞানের অভাব।
২. স্বাস্থ্যসম্মত দুধের অপ্রতুলতা।
৩. দুধের অসম সরবরাহ।
৪. দুধের অধিক পচনশীল স্বভাব।
৫. দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণে সমস্যা।
৬. দুধ বিপণন নীতি না থাকা।
৭. কারিগরি জ্ঞানের অভাব।

দুধ বিপণন সমস্যার সমাধান

১. যুগোপযোগী দুধ বিপণন নীতি প্রণয়ন।
২. বহুল প্রচারের ব্যবস্থাকরণ।
৩. দেশীয় লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন।
৪. শিক্ষা পাঠ্যক্রমে বিষয়ের অন্তর্ভুক্তিকরণ।
৫. জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।
৬. কারিগরি দক্ষতা বাড়ানো।
৭. উদ্যোক্তাদের বিনাসুদে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও পুরস্কারের ব্যবস্থাকরণ।

২৪.৪.১ বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ

দুগ্ধ শিল্পে জীবাণু উপকার ও অপকার দু'ই করে থাকে। ব্যাকটেরিয়া যেমন দুধের পচন ধরায় তেমনি ব্যাকটেরিয়া সময়মত বিশেষক্ষেত্রে ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন পুষ্টিকর , সুস্বাদু ও মানুষের স্বাস্থের জন্য উপকারী দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। যেমন দই ও পনির তৈরীতে নির্দিষ্ট জীবাণুই মূখ্য ভুমিকা পালন করে থাকে।
দুধ তাপ দিয়ে খাওয়া ছাড়াও দুধ দ্বারা আরও বহুবিধ পুষ্টিকর সুস্বাদু খাবার বানানো যায় যেমন -ননী, মাখন , আইসক্রিম, ঘি, পনির, দই ইত্যাদি।

দই ঃ আমাদের দেশে দই অত্যন্ত জনপ্রিয় দুগ্ধজাত খাদ্য। দই তৈরী করতে দুধকে অনেকক্ষন জ্বাল দিয়ে ঘন করতে হয়, ১০ কেজি পরিমাণ দুধকে জ্বাল দিয়ে ৬.৫-৭ কেজি করে তার সংগে পূর্বের দই এর বীজ মিশিয়ে

দিয়ে পরিষ্কার পাত্রে ঢেলে রেখে দিলেই দই তৈরীর প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ অবস্থায় রেখে দিলে দুধের উপর ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়া শুরু হয় এবং দই তৈরী হয়। ব্যাকটেরিয়া ল্যাকটিক এসিড, এসিটিক এসিড ও ডাইএসিটাইল এবং অন্যান্য গ্যাস উৎপন্ন করে। দই তৈরী হলে এক প্রকার সুগন্ধ পাওয়া যায় যা সাধারনতঃ ডাইএসিটাইলের জন্য সৃষ্টি হয়।

ঘিঃ ঘি অত্যধিক চর্বিযুক্ত এক প্রকার দুগ্ধজাত দ্রব্য । ঘি নানা ভাবে তৈরী করা যায়। সাধারনত ক্রীম, দুধের সর ও মাখন তাপ দিয়ে ফুটিয়ে ঘি তৈরী করা হয়।

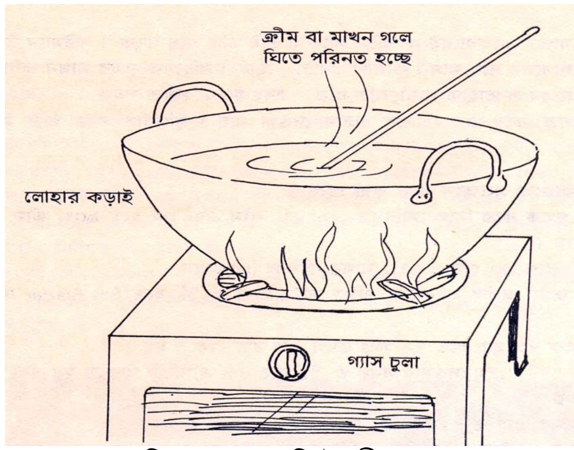

চিত্র ২৪.৩ ঃ ঘি তৈরী হচ্ছে

আইসক্রীমঃ ঠান্ডায় জমানো এক প্রকার দুগ্ধজাত দ্রব্য। আইসক্রীম বিভিন্ন রকমের হতে পারে। আইসক্রীম তৈরীর জন্য খাঁটি দুধ/ কনডেন্সড বা গুড়ো দুধ পানিতে গুলে ব্যবহার করা যায়। প্রথমে বিভিন্ন উপাদান মেপে নিতে হবে। দুধের সাথে ১৬% হারে চিনি মিশিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে। তারপর নির্দিষ্ট অনুপাতে অন্যান্য উপাদান মিশিয়ে ফ্রিজারে দিতে হবে। আইসক্রীম অনেক সময় সমানভাবে জমে না ফলে খেতে ভাল লাগে না। ০.৫% হারে কর্ন-ফ্লাওয়ার দিলে ভালভাবে জমাট বাঁধবে। আইসক্রীমে ইচ্ছামত সুগন্ধ ব্যবহার করা যায়। সাধারণতঃ ভ্যানিলা, স্ট্রবেরী, চকোলেট, মাংগো এসেন্স ব্যবহার করা হয়। প্রতি লিটার দুধ অনুপাতে ৩ মিঃ লিঃ সেন্ট দিলেই যথেষ্ট।

আইসক্রীম তৈরীর কয়েকটি ফর্মূলা

১। ক) ঘন দুধ ৪ লিটার
খ) ক্রিম ১ লিটার
গ) চিনি ১ কেজি
ঘ) কর্ন-ফ্লাওয়ার ১৮০ গ্রাম
ঙ) এসেন্স ৪ চা চামচ।

দুধ ও চিনি একসঙ্গে জ্বাল দিয়ে ঠান্ডা হলে অন্যান্য করে
দব্য মিশিয়ে ফ্রিজারে দিতে হবে।

২। ক) দুধ ৪ লিটার
খ) কনডেন্স দুধ ২৫০ গ্রাম
গ) চিনি ১ কেজি
ঘ) চকোলেট ৫০ গ্রাম
ঙ) এসেন্স ৪ চা চামচ।

দুধ, চিনি ও চকোলেট একসঙ্গে জ্বাল দিয়ে ঠান্ডা
অন্যান্য দ্রব্য মিশিয়ে ফ্রিজারে রাখতে হবে।

৩। ক) ঘন দুধ ৫ লিটার
খ) চিনি ১ কেজি
গ) কমলালেবু/ আনারসের রস ১ কেজি

দুধ ও চিনি জ্বাল দিয়ে ঠান্ডা করে ফলের রস মিশিয়ে ফ্রিজারে দিতে হবে।

দুগ্ধ প্যাকেটজাত করা

প্রতিযোগীতামূলক বাজারে বিভিন্নভাবে গ্রাহকের নিকট আরও আকর্ষণীয় ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে উপস্থাপন করার একটি উলেখযোগ্য পদ্ধতি হল দুধ প্যাকেটজাত করা। দুধ প্যাকেট করার জন্য প্রধানতঃ কাঁচ, কাগজ, কার্ডবোর্ড এবং প্লাষ্টিক জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। এ সমস্ত প্যাকেট একবার বা বহুবার ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরী করা যায়।

কাঁচের বোতল ঃ বিভিন্ন আকারের কাঁচের বোতলে দুধ ভরে ক্রেতার নিকট সরবরাহ করা যায়। কাঁচের বোতল অনেকদিন যাবৎ ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিবার ব্যবহারের পর গুড়া সাবান দিয়ে পরিস্কার করে পানিতে ফুটিয়ে শুকিয়ে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। হাতে বা স্বয়ংক্রিয় মেশিনে দুধ কাঁচের বোতলে ভরা যেতে পারে। এ বোতল যানবাহনে কাঠের বক্সে করে দূর দূরান্তে পরিবহন করা যায়।

কাগজ বা কার্ডবোর্ডের প্যাকেট ঃ কাগজ বা কার্ডবোর্ডকে একবার ব্যবহারযোগ্য প্যাকেট হিসাবে তৈরী করা যায়। আজ পলিথিনের আবরণযুক্ত কাগজের প্যাকেট ব্যবহার হচ্ছে। কাগজের প্যাকেট সাধারণতঃ কাপ, ত্রিভূজাকৃতি, গোলাকার আয়তাকার ইত্যাদি নানা আকারের করা যায়। কাগজের প্যাকেটে দুধ প্যাকেটজাত করতে বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। জীবাণুমুক্ত দুধকে কাগজের প্যাকেটে রেফ্রিজারেশন ছাড়াই বেশকিছু সময় সংরক্ষণ করা যায় এবং দুরদুরান্তে পরিবহন করা যায়।

প্লাষ্টিক প্যাকেট ঃ বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় নানা আকৃতির প্লাষ্টিক বোতল বা প্যাকেট দুগ্ধ শিল্পে ব্যবহার করা হয়। দুধ প্যাকেট করার কাজে সফলভাবে পলিথিনের প্যাকেট ব্যবহার করা যায়। এ জাতীয় প্যাকেটে জীবাণুমুক্ত দুধ ভরে মুখ বন্ধ করে লাভজনকভাবে ব্যবসা করা যায়। দুধ প্যাকেটে ভরার সাথে সাথে যত দ্রুত সম্ভব ঠান্ডা স্থানে বা রেফ্রিজারেটরে রাখতে হয়। প্যাকেটকে বিভিন্ন রংয়ের ও আকর্ষণীয় করে তৈরী করা যায়।

বর্তমানে আমাদের দেশে বেশ কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সরকারী প্রতিষ্ঠান দুধ প্যাকেট করে বাজারজাত করছে। খুব অল্প খরচ ও অতি সাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করেই ছোট কিংবা বড় যে কোন খামারের উৎপাদিত দুধ এ পদ্ধতিতে প্যাকেট করে বাজারজাত করা যেতে পারে।

২৪.৫ পনির উৎপাদন ও বাজারজাতকরন

"পনির দুগ্ধজাত পণ্যের মধ্যে একটি অন্যতম পণ্য যা দুগ্ধ জমাট এনজাইম রেনিন দুধে যোগ করে তৈরী করা হয়"। আমাদের দেশীয় পনির মূলতঃ কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে যা আন্তার্জাতিক ভাবে ঢাকা পনির নামে পরিচিত। অষ্টগ্রাম বাসীরা জানান যে ৩০০-৩৫০ বছর আগে থেকে অষ্টগ্রামে পনির উৎপন্ন হয়।

পনিরের সুবিধা

১. দুধ উত্তম পানীয় ও পুষ্টিকর খাদ্য হলেও অতি অল্প সময়ে নষ্ট হয়ে যায়।
২. পনির সংরক্ষণ সমস্যা কম এবং একটি লাভজনক পণ্য।
৩. পনিরকে সাধারণ তাপমাত্রায় ১০-২০ দিন রাখা যায়।
৪. অনুন্নত স্থানে সহজ উপায়ে এবং কম খরচে দুগ্ধ সংরক্ষণের অন্যতম ও প্রধান উপায় হচ্ছে পনির উৎপাদন।
৫. প্রাকৃতিক তাপমাত্রায় এর সংরক্ষণকাল অধিক হওয়ায় পনিরকে সুবিধাজনক সময়ে বাজারজাত করা যায় যা দুধের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।
৬. অধিক সংরক্ষণকাল থাকায় পনিরকে দূর দূরান্তে বাজারজাত করাও সম্ভব।

৭. পনির দুগ্ধ অমিষ জাতীয় খাদ্যের অতি উত্তম উৎস যা বাচ্চা ও বৃদ্ধদের আমিষ পুষ্টি চাহিদা মেটাতে উলেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম।

পনির তৈরির উপকরণ

গরু, মহিষ বা ছাগলের দুধ, মাওয়া (প্রক্রিয়াজাত পাকস্থলী), মাওয়ার পানি, এ্যালুমিনিয়াম পাত্র (৫০ লিটার), ষ্টেইনলেস ষ্টীলের ধারালো ছুরি, বাঁশের তৈরী ছুরি, বাঁশের তৈরী ঝুড়ি বা টুকরি, খাদ্য লবণ এবং পনির ছিদ্র করার জন্য চোখা কাঠি (পরিধি প্রায় ২.৫-৩সেমি.)।

মাওয়া তৈরী

সাধারণ ভাবে মাওয়া হলো লবণ দ্বারা বিশেষভাবে প্রাক্রিয়াকৃত গরু বা ছাগলের পাকস্থলী যা রোদে শুকিয়ে তৈরী করা হয়। গরু বা ছাগলের পাকস্থলী চারটি অংশে বিভক্ত যথাঃ রুমেন, রেটিকুলাম, ওমসাম ও অ্যাবোমেসাম বা প্রকৃত পাকস্থলী (পাকস্থলীর শেষাংশ)। এই অ্যাবোমেসাম দিয়েই মাওয়া তৈরী করা হয়। বাহ্যিক ভাবে যা দেখতে অনেকটা বাংলা অক্ষর ৫ এর মত। কসাই খানা হতে বাড়ন্ত গরুর এই পাকস্থলী ১০-১৫ টাকা দরে ক্রয় করা হয়। পাকস্থলীর ভিতরের বর্জ্য অপসারণের জন্য ধারালো চাকু দিয়ে কেটে টিউব ওয়েলের পানি দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ধুতে হবে যাতে পাকস্থলীর ভিতরের পিচ্ছিল(মিউকাস) অংশ পানির সাথে ধুয়ে না যায়। এবার বাঁশের চাটাই এর উপর পাকস্থলী এমন ভাবে বিছানো হয় যাতে পাকস্থলীর ভিতরের অংশ উপরে থাকে।

অতঃপর ২৫০-৫০০ গ্রাম পরিমাণ খাদ্য লবণ পাকস্থলীতে সমভাবে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে পাকস্থলী ৩-৪ দিন রোধে শুকায়ে টুকরা টুকরা করে কেটে মাওয়া তৈরী করা হয়। মাওয়া সাধারণতঃ ঠান্ডা জায়গায় যে কোন পাত্রে রেখে প্রায় ৩০ দিন পর্যন্ত ভালভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

মাওয়ার পানি প্রস্তুতকরণ (৪০ কেজি দুধের হিসাব)

গ্রীষ্মকালে একটি গরুর প্রক্রিয়াকৃত প্রকৃত পাকস্থলী বা মাওয়ার ১/৪ অংশ বা ২৫ শতাংশ এবং শীতকালে ১/৩ অংশ বা ৩৩ শতাংশ পরিমাণ মাওয়া একটি পাত্রে নিয়ে তাতে ২-৩ কেজি পরিমাণ পানি ও ১ কেজি পরিমাণ কাঁচা দুধ মিশায়ে ২৪ ঘন্টা ভিজায়ে রাখতে হবে। ব্যবহারের পূর্বে মাওয়ার টুকরো গুলো দুধ ও পানির দ্রবণে ভালভাবে মিশ্রিত করতে হবে। পনির তৈরির পূর্বে মাওয়ার পানি অবশ্যই পাতলা পরিস্কার কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে। স্থানীয় ভাষায় এই পানিই ”মাওয়ার পানি” নামে পরিচিত।

দুধ থেকে পনির তৈরী

দুগ্ধ দহনের ৩-4 ঘন্টা পর ৪০ কেজি কাঁচা দুধ ছেকে একটি এলুমিনিয়ামের পাত্রে নিতে হবে। ২-৩ কেজি পরিমাণ মাওয়ার পানি ধীরে ধীরে দুধে যোগ করতে হবে এবং ভাল ভাবে নাড়তে হবে। দুধ জমাট বাঁধার জন্য ১০-৩০ মিনিট সময় স্থির রেখে দিতে হবে। দুধ জমাট হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য বাঁশের তৈরী পাতলা ছুরি দুধে প্রবেশ করায়ে দেখতে হবে। যদি ছুরিটি সোজা দন্ডায়মান থাকে তবে বুঝতে হবে দুধ জমাট সঠিক হয়েছে।

- জমাট বাঁধার ১০ মিনিট পর বাঁশের তৈরী ছুরি দ্বারা জমাট দুধকে আড়াআড়ি ভাবে কেটে দিতে হবে।
- কাটার ফলে কর্তিত জায়গা থেকে নীলাভ বর্ণের পানি বের হয়ে আসলে এর ১০ মিনিট পর কর্তিত জমাট দুধকে হাত দিয়ে আলতো ভাবে ভেঙ্গে দিতে হবে।
- ছানাকে উত্তম রূপে থিতানোর জন্য ৫-১০ মি. সময় রেখে দুই হাত দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে খুব ধীরে ধীরে পাত্রের একপাশে জমা করতে হবে। এমন ভাবে চাপ প্রয়োগ করতে হবে যেন ছানার ভিতর খুব বেশী পানি না থাকে এবং চাপা অবস্থায় থাকে।
- এবার ছানাকে ষ্টেইনলেস ষ্টীলের ধারালো ছুরি দ্বারা টুকরো টুকরো করে কাটতে হবে।

- অতঃপর ছানার টুকরাকে বাঁশের তৈরী ঝুড়িতে (প্রতিটি ঝুড়ির ব্যাস হবে প্রায় ১৬ সেমি. এবং উচ্চতা হবে প্রায় ৬-৭ সেমি.) হাত দ্বারা ঠেসে ভরতে হবে। ৪০ কেজি দুধের ছানা দিয়ে ৫ টি ঝুড়ি(প্রতিটি ঝুড়িতে পনিরের ওজন হবে ১ কেজি) পূর্ণ করা সম্ভব।
- নির্দিষ্ট আকার আকৃতির(ঝুড়ির ছাপ) জন্য ১৫ মিনিট পর ছানা পিন্ডকে প্রথমে উল্টিয়ে দিতে হবে।
- পানি নিষ্কশনের জন্য ছানার পিন্ডসহ ঝুড়ি একটি পাত্রে প্রায় ১৫ ঘন্টা রাখতে হবে এবং সেই সাথে ঝুড়িটি অন্য একটি পাত্র দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে, যাতে বাইরের ময়লা বা পোকামাকড় না পড়ে।
- ১৫ ঘন্টা পর ঝুড়ির পনির পিন্ডকে ২য় বার উল্টিয়ে চোখা কাঠি দ্বারা (ব্যাস প্রায় ২.৫-৩সেমি.) কেন্দ্র বা মাঝ বরাবর তিনটি ছিদ্র করে (ত্রিভুজাকৃতির) তাতে ৫০ গ্রাম খাবার লবণ ঢুকিয়ে দিতে হবে।
- বাড়তি লবণ পনির পিন্ডের চারপাশে মেখে দিতে হবে। এতে লবণ ধীরে ধীরে গলে সমস্ত পনির পিন্ডে বিস্তার লাভ করবে। এভাবে ৩ দিন পর্যন্ত রাখতে হবে।

পনির উৎপাদন

শীতকালে প্রতি ৮ কেজি গরুর দুধ হতে ১ কেজি পনির এবং গ্রীষ্মকালে ৯ কেজি দুধ থেকে ১ কেজি পনির উৎপাদিত হয়ে থাকে। মহিষের দুধ হতে গড়ে প্রতি ৭ কেজি দুধ থেকে ১ কেজি পনির উৎপাদিত হয়।

পনির সংরক্ষণ

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে স্বাভাবিক পরিবেশ/তাপমাত্রায় অষ্টগ্রাম পনিরকে ৭-১০ দিন এবং শীতকালে ১৫-২০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। পনির বেশী দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হলে ২ দিন পর পর লবণ পানি দিয়ে ঘষে দিতে হবে। তবে কোন কোন প্রস্তুতকারক পনিরের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি এবং বিশেষ আস্বাদের জন্য উন্মুক্ত আগুনের চুলার ধোঁয়ায় রেখে ধোঁয়ায়িত করে থাকেন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পনিরকে ১ মাস থেকে ২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

বাজারজাত করন

অষ্টগ্রামের পনির প্রস্তুতকারক সাধারণতঃ বিভিন্ন এলাকায় খুরচা বাজারে এবং ঢাকাতে পাইকারী বিক্রি করে থাকেন। খুরচা বাজারে পনিরকে অনেক সময় ভোক্তার চাহিদা অনুসারে কেটে কেটে বিক্রি করা হয়। এছাড়াও কিছু প্রস্তুতকারক নিজ বাড়ীতে বসে পনির বিক্রি করে থাকেন।

ছানার পানির ব্যবহার

প্রতি ৪০ কেজি দুধ থেকে পনির তৈরির সময় উপজাত হিসাবে প্রায় ৩৫-৩৬ লিটার ছানার পানি পাওয়া যায়। এই পানির ২-৩ লিটারে প্রথম দিনের ভিজানো মাওয়া যোগ করে মাওয়ার পানি তৈরী করা যায়। এভাবে ভিজানো মাওয়া ৩ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও ছানার পানি মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

যে সকল অঞ্চলে দুধের দাম বেশী সেখানে পনির তৈরী না করাই ভাল। কারন এতে করে পনিরের উৎপাদন খরচ বেশী পড়বে।

উৎসঃ

*গাভী পালন গাইড - এ. টি. এম. ফজলুল কাদের
*উচ্চতর প্রাণি বিজ্ঞান - এস এম ইমাম হুসাইন
*প্রাণি খামার ও চিকিৎসা - এস এম ইমাম হুসাইন
*প্রাণি পালন - কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

* প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা - বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট

মডিউল-২৫ ঃ
গবাদি প্রাণির রোগ ও স্বাস্থ্যবিধি

২৫.১.১ গবাদি প্রাণি সুস্থ থাকার লক্ষণ

- প্রাণি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি সর্তক থাকবে ও স্বাভাবিক ভাবে নড়াচড়া করবে।
- নাক, মুখ, চোখ পরিষ্কার ও উজ্জল থাকবে।
- শরীরের লোম মসৃণ ও চকচকে থাকবে।
- নাকের অগ্রভাগ ভেজা ভেজা ও বিন্দু বিন্দু ঘাম থাকবে।
- কান ও ওলান নড়াচড়া করে মশা-মাছি তাড়াবে।
- স্বাভাবিকভাবে খাওয়া দাওয়া করবে।
- জাবর কাটবে।
- পিপাসা স্বাভাবিক থাকবে।
- মল-মূত্র স্বাভাবিক থাকবে।
- শরীরের তাপ স্বাভাবিক থাকবে।

প্রাণি অসুস্থ হলে উপরোক্ত অবস্থার ব্যাতিক্রম দেখা যাবে এবং যে রোগে আক্রান্ত হবে সেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবে।

২৫.১.২ রোগ জীবাণু ছড়ানোর মাধ্যম

প্রাণির দেহে বিভিন্ন ভাবে জীবাণু প্রবেশ করতে পারে। সাধারণতঃ মুখ-গহ্বর, নাসারন্ধ্র, চামড়ার ক্ষত, যোনি পথ, মল-মূত্র ত্যাগের রাস্তা, বাঁটের ছিদ্র, চোখ ইত্যাদির মাধ্যমে রোগের জীবাণু দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। গবাদি প্রাণির রোগ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ জীবাণু ছড়ানোর উপায় সর্ম্পকে ধারণা থাকা দরকার। সাধারণতঃ নিম্নোক্তভাবে রোগ জীবাণু ছড়িয়ে থাকে।

১। **বাতাসের মাধ্যমে ঃ** অনেক মারাত্মক রোগের জীবাণু বাতাসের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন- ক্ষুরা রোগের জীবাণু ।

২। **জীব জন্তু ও কীট পতঙ্গের মাধ্যমে ঃ** কুকুর, বিড়াল, শৃগাল, বেজী, ইঁদুর, মশা, মাছি, বিভিন্ন কীট পতঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা রোগ জীবাণু ছড়াতে পারে।

৩। **বিভিন্ন ধরনের পাখীর মাধ্যমে ঃ** কাক, চিল, শকুন ইত্যাদি নানা রকমের পাখীর মাধ্যমে রোগ জীবাণু ছড়াতে পারে।

৪। **নদী, জলাশয়, বৃষ্টির পানি দ্বারা ঃ** প্রাণীর মৃতদেহ বা সংস্পর্শযুক্ত দ্রব্যাদি নদী, জলাশয় বা মাটিতে ফেলে রাখলে মৃতদেহ থেকে নিঃসৃত পদার্থ বা অন্যান্য দ্রব্যাদিতে লেগে থাকা রোগ জীবাণু পানির স্রোতে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

৫। **হাট বাজারের প্রাণি পাখী বা প্রাণিজাত দ্রব্যাদির মাধ্যমেঃ** অনেক সময় রোগাক্রান্ত বা সংস্পর্শযুক্ত প্রাণিপাখি বিক্রয়ের জন্য হাট বাজারে নেওয়া হয়। এ সকল প্রাণি পাখী পরিবহনের রাস্তা এবং বিক্রয় স্থলে রোগ জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। হাটে বাজারের অন্যান্য সুস্থ প্রাণি পাখী রোগাক্রান্তদের সংস্পর্শে এসে সংক্রামিত হয় এবং এইভাবে রোগ বিস্তার লাভ করে। তাছাড়াও আমাদের দেশের লোকজনের অজ্ঞতার কারণে হাট বাজার ও অন্যান্য স্থানে রোগাক্রান্ত প্রাণি পাখীর মাংশ বিক্রি হয়, এসবের মাধ্যমেও রোগ জীবাণু ছড়ায়।

৬। **প্রাণি পাখী বহনকারী যানবাহনের মাধ্যমে ঃ** বাস, ট্রেন,লঞ্চ , ষ্টীমার, নৌকা, প্রভৃতি যোগে প্রাণি পাখী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করার সময় রোগাক্রান্ত বা রোগের বাহক থেকে ঐ সব যান বাহনে রোগের জীবাণু লেগে যায় পরে অন্যান্য মালামাল, প্রাণি পাখী বা মানুষের মাধ্যমে তা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

৭। **প্রাণির চামড়া বা অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা ঃ** আমাদের দেশে রোগে মৃত প্রাণি পাখী সাধারণতঃ মাঠে ঘাটে ফেলে দেওয়া হয় যা কোন ক্রমেই উচিত নয়। এ সব প্রাণির চামড়া, হাড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি মুচি বা অন্য লোকজন বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যায়, মৃত প্রাণি যে রোগে মারা গাছে সে রোগের জীবাণু চামড়া, হাড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করে।

৮। **প্রাণি পাখীর পরিচর্যাকারী দ্বারা ঃ** রোগাক্রান্ত প্রাণির পরিচর্যাকারী তার দেহ, পোষাক পরিচ্ছদ ও আনুসংগিক সরঞ্জামাদি দ্বারা রোগের জীবাণু অন্যত্র ছড়াতে পারে।

৯। **পরিদর্শক দ্বারা ঃ** খামার দেখতে বা বেড়াতে আসা লোকজনের মাধ্যমেও রোগ জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে। যেখান থেকে তারা এসেছেন সেখানে সংক্রমক রোগের প্রাদুর্ভাব থাকলে সে সকল রোগের জীবাণু বিভিন্নভাবে তাদের সাথে আসে।

২৫.২.১ সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা

সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১। নতুন ক্রয় করা বা অন্য কোন ভাবে সংগৃহীত প্রাণিকে এনেই খামারের অন্যান্য প্রাণির সঙ্গে রাখা যাবে না। তিন সপ্তাহ সময় সেগুলোকে পৃথকভাবে রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে যদি নতুন প্রাণির কোন রোগ লক্ষণ প্রকাশ না পায় তবেই খামারের পুরানো প্রাণির সঙ্গে রাখা যাবে।

২। বহিরাগত দর্শকদের খামারে প্রবেশের সময় পা জুতার তলা জীবাণুনাশক পদার্থ গুলানো পানিতে ডুবিয়ে নিতে হবে।

৩। যে সকল সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা পাওয়া যায় সে সকল রোগের টিকা সঠিক সময়ে নিয়ম মত দিতে হবে। নিজের খামারে টিকা প্রদানের সাথে সাথে পার্শ্ববতী খামার বা প্রাণি সমূহকেও একই টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। প্রাণির খাদ্য টাটকা, নির্ভেজাল হতে হবে ও স্বাস্থ্য সম্মতভাবে নিজ খামারেই মিশ্রিত করতে হবে।

৫। কোন এলাকাতে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে সে এলাকার প্রাণি পাখী বা প্রাণি পাখী জাত দ্রব্যাদি হাটে বাজারে বা ঐ এলাকার বাইরে যাতে যেতে না পারে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬। খামারে বন্য জন্তু প্রবেশ ও চলাচল বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া মশা-মাছি ইঁদুর ও অন্যান্য কীট পতঙ্গ ধ্বংস করতে হবে।

৭। খামারের রোগাক্রান্ত প্রাণির চিকিৎসা করতে হবে, ভাল হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে তা জবাই করে প্রাণি চিকিৎসকের মতে মাংস খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলে প্রাণির মরদেহ মাটির নীচে পুঁতে রাখতে হবে বা পুঁড়িয়ে ফেলতে হবে।

২৫.২.২ সংক্রামক রোগ দেখা দিলে গৃহীত ব্যবস্থা সমূহ

১। পৃথক করণ ঃ খামারে বা কোন বাড়িতে রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোগাক্রান্ত প্রাণি পৃথক করতে হবে ও চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রাণির কাজ কর্ম করার জন্য যদি একজন লোকই থাকে তবে প্রথমে সুস্থ প্রাণির কাজ কর্ম ও খাদ্য প্রদান করে অসুস্থ বা আক্রান্ত প্রাণির সেবা করতে হবে। যদি কোন প্রাণি রোগাক্রান্ত বলে সন্দেহ হয় তাকে পৃথক করে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

২। আক্রান্ত প্রাণির চিকিৎসা অথবা নির্মূল করণ ঃ যে সকল রোগের চিকিৎসা আছে এবং চিকিৎসা করলে ভাল হয়ে যায় সে সকল ক্ষেত্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে, কিন্তু যে রোগের চিকিৎসা করলেও পরিপূর্ণভাবে ভাল হয় না এবং রোগের বাহক হিসাবে প্রাণিটির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে সে সব প্রাণিকে জবাই করে মৃতদেহ পুঁড়িয়ে অথবা মাটির নীচে পুঁতে রাখতে হবে।

৩। রোগাক্রান্ত এলাকার প্রাণি বিক্রয় না করা ঃ রোগ দেখা দিলেই অনেক লোকের মধ্যে রোগাক্রান্ত প্রাণি পাখী বাজারে বিক্রয়ের প্রবণতা দেখা যায়, এর ফলে রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ প্রবণতা অবশ্যই রোধ করতে হবে। রোগাক্রান্ত এলাকার প্রাণি পাখী যেন বাজারে বা রাস্তায় বের না হতে পারে সেদিকে সবার দৃষ্টি রাখতে হবে।

৪। রোগাক্রান্ত প্রাণি ও তার পরিচর্যা ঃ রোগাক্রান্ত প্রাণির সেবা বা আনুসাংগিক ব্যবস্থাপনা ভিন্ন লোক দ্বারা করানোই ভাল। রোগাক্রান্ত প্রাণির ঘরের সমস্ত কিছু পৃথক থাকতে হবে এবং তা সুস্থ প্রাণির ঘরে কখনই আনা যাবে না। রোগাক্রান্ত প্রাণির ঘরের ময়লা, আবর্জনা, খড়-কুটা সবই পুড়িয়ে ফেলাই উত্তম না হলে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে। প্রতিদিন ঘরে সুবিধাজনক কোন জীবাণু নাশক যেমন-স্যাভলন, আইওসান, ফিনাইল বা ডেটল ব্যবহার করতে হবে।

৫। মৃত দেহের সৎকার ঃ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত প্রাণি মারা গেলে তার দেহে প্রচুর পরিমাণে সংশিষ্ট রোগের জীবাণু থাকে। রোগে মরা প্রাণির মৃতদেহ পুঁড়িয়ে ফেলাই উত্তম না পারলে অবশ্যই মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। মৃত প্রাণির ঘরের সকল আসবাবপত্র সহ সংশিষ্ট অন্যান্য সকল কিছু এমনকি ঘরের দেওয়াল, বেড়া, সিলিং, সব কিছু জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে এবং এই ঘরে সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন সুস্থ প্রাণি না তুলে কমপক্ষে ২-৩ সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। মৃত প্রাণি ঘর থেকে বের করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রাণির দেহ থেকে কোন পদার্থ না পড়ে। এই সকল পদার্থে প্রচুর জীবাণু থাকে। সংক্রামক রোগে আক্রান্ত মৃত প্রাণির চামড়া ছাড়ানো যাবে না। মৃত দেহ মাটিতে পোঁতার পর খেয়াল রাখতে হবে যেন কুকুর, শেয়াল বা অন্য কোন বন্য জন্তু তা তুলে না ফেলে। মাটি চাপা দেওয়ার আগে মৃত দেহের উপর চুন, সোডা অথবা ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে দিতে পারলে ভাল হয়।

৬। প্রচার ঃ সংক্রামক রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে এলাকার জন সাধারণকে সে রোগ সম্পর্কে সচেতন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য ঢোল, মাইক, প্রয়োজনে পত্র-পত্রিকায়, বেতার বা টেলিভিশনে প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

২৫.৩ গবাদি প্রাণির সংক্রামক রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার

ভাইরাসজনিত রোগ

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	প্রতিকার
১। ক্ষুরারোগ	এক ধরনের অতি সূক্ষ্ণ ভাইরাস দ্বারা হয়। এ রোগ মারাত্মক ছোঁয়াচে। আক্রান্ত প্রাণি, খাদ্য, পানি, বায়ু এমনকি কাপড়-চোপড় ও মানুষের মাধ্যমে ছড়ায়	মুখে, জিহ্বায় ও ক্ষুরায় ফোস্কা পড়ে। পরে ফোস্কা ফেটে ঘা হয়। মুখ দিয়ে লালা ঝরে। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। প্রাণি খেতে, হাঁটতে ও কাজ করতে পারে না। প্রাণি দুর্বল হয়ে যায়। গাভীর দুধ কমে যায়। এ রোগে বাছুরের মৃত্যুর হার বেশি।	অসুস্থ প্রাণিকে সুস্থ প্রাণি থেকে আলাদা রাখা। সুস্থ সকল প্রাণিদের ক্ষুরা রোগের টিকা দেয়া। প্রতিদিন গোয়াল ঘর জীবাণুনাশক যেমন ডেটল বা ফিনাইল দ্বারা ভালোভাবে ধুয়ে দেওয়া। প্রাণিকে নরম খাদ্য সরবরাহ করা ও ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করা।
২। জলাতঙ্ক	ভা্ইরাস জনিত একটি মারাত্মক রোগ। কুকুর, বিড়াল ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী এ ভাইরাস বহন করে। আক্রান্ত প্রাণীর লালায় এ ভাইরাস থাকে ও কামড়ের মাধ্যমে গবাদি প্রাণি আক্রান্ত হয়।	রোগের লক্ষণ দুরকম যথা (১) পাগলামী ভাব ও (২) নিস্তেজ ভাব। পাগলামী ভাবে প্রাণি অন্য প্রাণিকে আক্রমণ করতে চায়। মুখ দিয়ে লালা ঝরে ও পরে আস্তে আস্তে পক্ষাঘাত দেখা যায়। নিস্তেজ অবস্থায় প্রাণি চুপচাপ থাকে। প্রথমে পিছনের অংশ অবশ হয়ে যায়। উভয় অবস্থাতেই প্রাণির চোয়ালের অবশতা দেখা দেয়। জিহ্বা ঝুলে পড়ে দৃষ্টি শূন্যতা দেখা যায় ও কিছুই গিলতে পারে না।	এ রোগে চিকিৎসায় কোন ফল হয় না। প্রাণির আক্রান্ত স্থানে সাথে সাথে সাবান বা সাইট্রিক এসিড দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়। বেওয়ারিশ কুকুরকে মেরে ফেলতে হয় ও পোষা প্রাণীদেরকে প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	প্রতিকার
৩। গো-বসন্ত	এটি ভাইরাস জীবাণু দ্বারা ঘটিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। আক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্শে, খাদ্য, পানি, বাতাস, শ্বাস-প্রশ্বাস, গোয়ালার হাত, মশা-মাছির মাধ্যমে সুস্থ গবাদি প্রাণি আক্রান্ত হয়।	শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। মুখে ও খাদ্য নালীতে ঘা হয় পায়খানা প্রথমে শক্ত ও পরে পাতলা হয়। মুখে দুর্গন্ধ হয়। শ্বাসকষ্ট হয়। নাক ও চোখ দিয়ে স্রাব ঝরে। প্রাণির খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আক্রান্ত প্রাণি ২৪ ঘন্টা থেকে ৭ দিনের মধ্যে মারা যায়।	আক্রান্ত প্রাণিকে আলাদা ঘরে রাখা। সুস্থ প্রাণিকে নিয়মিত টিকা দেয়া ও স্বাস্থ্যসম্মত লালন-পালন ব্যবস্থা করা।
৪। রিন্ডার পেস্ট	এটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে ভাইরাস জনিত রোগ। আক্রান্ত প্রাণির সংস্পর্শে, শ্বাস-প্রশ্বাস, মলমূত্র, খাদ্যদ্রব্য, পানি, বায়ু দ্বারা সুস্থ গবাদি প্রাণি আক্রান্ত হয়।	জ্বর হয়, চোখ, নাক মুখ দিয়ে পানি ঝরে ও নাকের পর্দা রক্তাভ হয়। মুখ দিয়ে লালা ঝরে। দুগন্ধযুক্ত আম ও রক্ত মিশ্রিত ডায়রিয়া হয়। দেহের তাপমাত্রা কমে যায় ও প্রাণি ৭ দিনের মধ্যে মারা যায়।	আক্রান্ত প্রাণিকে আলাদা রাখা, সুস্থ প্রাণিকে নিয়মিত টিকা দেয়া ও গোয়াল ঘরে জীবাণুনাশক ব্যবহার করা।

২৫.৪ ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	প্রতিকার
১। তড়কা	*Bacillus anthracis* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়। এ রোগের জীবাণু মাটি থেকে সরাসরি ঘাস বা অন্য খাদ্যের সাথে মুখ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। আক্রান্ত প্রাণী হঠাৎ মারা যায় ও মৃত্যুর হার বেশি	অতি তীব্র প্রকৃতির হলে প্রাণি দ্রুত নিঃশ্বাস নেয় ও দেহ মাটিতে ঢলে পড়ে এবং খিচুনি দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যায়। তীব্র প্রকৃতির হলে প্রাণির জ্বর আসে, তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ক্ষুধামন্দা নিস্তেজ ও পেট ফাঁপা দেখা যায়। দ্রুত নিঃশ্বাস নেয় ও কাঁপতে থাকে। রক্ত মিশ্রিত পাতলা পায়খানা হয়। নাক, মুখ ও মল দ্বার দিয়ে রক্ত ক্ষরণ হয়। রক্ত জমাট বাঁধে না।	এ রোগের জীবাণু সহজে মরে না বলে মৃত প্রাণিকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হয় বা পুড়ে ফেলতে হয়। রক্ত জমাট বাঁধে না বলে দেহে ও রক্তাক্ত মাটিতে জীবাণুনাশক ব্যবহার করতে হবে। আক্রান্ত প্রাণিকে আলাদা রাখতে হবে ও সুস্থ প্রাণিকে টিকা দিতে হবে।
২। বাদলা	*Clostridium chauvoei* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়। বর্ষাকালে ও ২ মাস থেকে ২ বছর বয়সের প্রাণিতে বেশি হয়। খাদ্য ও পানির মাধ্যমে এ রোগ সংক্রমিত হয়। এ রোগের জীবাণু স্পোর সৃষ্টি করে মাটিতে ৩-৪ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।	অতি তীব্র প্রকৃতির হলে প্রাণি হঠাৎ মারা যায়। তীব্র প্রকৃতির হলে ক্ষুধামন্দা জ্বর, পেটে গ্যাস, নাকের শ্লেস্মা দেখা যায়। প্রাণির পায়ের মাংসপেশী আক্রান্তের ফলে প্রাণি হাঁটতে পারে না ও খুঁড়িয়ে হাঁটে এবং মাংস পেশীতে চাপ দিলে পচ্ পচ্ শব্দ হয়।	আক্রান্ত প্রাণিকে আলাদা রাখতে হবে। মৃত দেহ মাটির নিচে পুঁতে রাখা বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। সেঁতস্যাঁতে এলাকা চারণভূমি বা বাসস্থানের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। বর্ষার ২ মাস পূর্বে ৬ মাস থেকে ২ বছরের সকল প্রাণিকে টিকা দিতে হবে।
৩। গলা ফুলা	*Pasteurella multocida* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়। সকল বয়সের প্রাণিই আক্রান্ত হয়। বর্ষার পর সেঁতস্যাঁতে জমিতে চরালে এ রোগ বেশি হয় অসুস্থ প্রাণির সংস্পর্শ, লালা, মলমূত্র, দূষিত খাদ্য ও পানি দ্বারা এ রোগ ছড়ায়।	অতি তীব্র প্রকৃতির হলে, হঠাৎ করে প্রাণির জ্বর আসে, তাপমাত্রা বেড়ে যায়, ক্ষুধামন্দা হয়, নাক, মুখ দিয়ে লালা ঝরে ও ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রাণি মারা যায়। তীব্র প্রকৃতির হলে উপরের লক্ষণ ছাড়াও প্রথমে গলার নিচে, পরে চোয়াল, বুক পেট ও কানের অংশ ফুলে যায়। শ্বাস নিতে কষ্ট হয় গলা বাড়িয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়।	অসুস্থ প্রাণিকে আলাদা রাখা ও সালফোনিলামাইড জাতীয় ইনজেকশন ব্যবহার করা। মৃতদেহ সৎকার করা। সব সুস্থ প্রাণিকে সুস্থ অবস্থায় নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা দেয়া।
রোগের নাম	**কারণ**	**লক্ষণ**	**প্রতিকার**
৪। ম্যাসটাইটিস বা ওলান প্রদাহ	*Streptococcus genus* ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস ও মাইকোপ্লাজমা দ্বারা হয়। অস্বাস্থ্যকর সেঁতস্যাঁতে বাসস্থান ময়লা হাতে দোহন, বাঁটে বা ওলানে আঘাত, ওলানে দুধ জমাট বেঁধে থাকা ইত্যাদি কারণে রোগজীবাণু সংক্রমিত হয়ে রোগ সৃষ্টি করে অর্থাৎ সংক্রমিত ওলান ও দূষিত পরিবেশ এ রোগ সৃষ্টি করে।	অতি তীব্র রোগের ক্ষেত্রে দুধের পরিবর্তন লক্ষণীয়, দুধ পাতলা ও কিছু জমাট বাঁধা হবে। ওলান লাল হয়ে ফুলে যায় ও গরম হয়। প্রাণি ব্যথা অনুভব করে ও তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ক্ষুধামন্দা, অবসাদভাব, জ্বর ইত্যাদি হয়। দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির হলে দুধের পরিমাণ কমে যায় ও ক্রমাণ্বয়ে দুধ ছানার মত ছাকা ছাকা হয়।	অসুস্থ প্রাণিকে সুস্থ প্রাণি থেকে আলাদা করা। গোয়াল ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। এ রোগ প্রতিরোধ করা খুব কঠিন, কারণ ওলানে কোন এন্টিবডি তৈরি হলে তা দুধের মাধ্যমে বের হয়ে যায়।

২৫.৫ গবাদি প্রাণির পরজীবী ঘটিত, অপুষ্টি জনিত ও বিষক্রিয়া জনিত ও অন্যান্য রোগসমূহের কারণ লক্ষণ ও প্রতিকার

১। পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট রোগসমূহ

(ক) দেহাভ্যন্তরের পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট রোগসমূহ

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	প্রতিকার
(১) পাকান্ত্রিক গোলকৃমি রোগ	গোলকৃমি দ্বারা সৃষ্টি রোগ। কৃমির ডিম, ভ্রূণযুক্ত কৃমির ডিম, কৃমির লার্ভায়, দূষিত পানি ও খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে বড় প্রাণিতে এবং লার্ভাযুক্ত শাল দুধের মাধ্যমে বাছুর আক্রান্ত হয়।	ডায়রিয়া, ক্ষুধামন্দা। ভগ্নস্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রকাশ পাওয়া । বাড়ন্ত প্রাণির বৃদ্ধি কমে যায়। বয়স্ক প্রাণির উৎপাদন কমে যায় ও রক্ত শূন্যতা দেখা যায়।	গোয়াল ঘর, আশপাশের জায়গা ও চারণভূমি পরিষ্কার রাখা। গোয়াল ঘরে নিয়মিত চুন ব্যবহার করা ও জলাবদ্ধ জমিতে প্রাণিকে চরানো যাবে না।
(২) হ্যাম্পসোর	*Stephanofilaria assamensis* প্রজাতির কৃমি দ্বারা এ রোগ হয়। হাম্পে এ রোগ বেশি হয়। মাছির মাধ্যমে ছড়ায়।	চর্ম প্রদাহ হয়, চামড়ার গুণগত মান ও মূল্য কমে যায়। গাভীর দুধ উৎপাদন কমে যায়।	ক্ষতস্থানে মাছি না বসতে পারা, ক্ষতস্থান পলিথিন বা কাপড় দ্বারা ঢেকে দেয়া, মাছি তাড়ানো ঔষধ বা তারপিন তৈল ব্যবহার করা। নেগুভোন মলম ব্যবহার করে কৃমি ধ্বংস করা।

(খ) পাতাকৃমি দ্বারা সৃষ্ট রোগসমূহ

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	প্রতিকার
(১) ফ্যাসিওলিয়াসিস	পাতাকৃমি ঃ ফ্যাসিওলিয়া প্রজাতির	প্রাণি শুকিয়ে যাওয়া, ডায়রিয়া, রক্ত স্বল্পতা ও সাব-ম্যান্ডিবুলার এডিমা দেখা যায়।	কৃমির মাধ্যমিক পোষক ধ্বংস করা ও কৃমি নাশক খাওয়ানো এবং প্রাণিকে সংক্রামণ থেকে মুক্ত রাখা।
(২)প্যারামফিস্টোমিয়াসিস	প্যারামফিস্টোমাস প্রজাতির পাতা কৃমি দ্বারা হয়।	ক্ষুধামন্দা, দুর্বলতা, ডায়রিয়া, বদহজম হয়।	ঐ
(৩)সিস্টোসোমিয়াসিস/ স্নোরিং ডিজিজ	সিস্টোসোমা প্রজাতির পাতা কৃমি দ্বারা সৃষ্ট হয়।	ডায়রিয়া, মলে রক্ত ও মিউকাস থাকে। ক্ষুধামন্দা, রক্তাল্পতা ও নিস্তেজভাব দেখা যায়। প্রাণি নাক ডাকে ও ঘড় ঘড় শব্দ হয়।	ঐ

(গ) ফিতাকৃমি সৃষ্ট রোগসমূহ

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	প্রতিকার
টেনিয়াসিস	টেনিয়া প্রজাতির ফিতাকৃমি দ্বারা সৃষ্ট	হৃৎপিন্ড সিস্ট, হৃৎপিন্ডে প্রদাহ ও হৃৎপিন্ডের অকৃতকার্যতা ঘটে।	কৃমিনাশক প্রতিশোধক ব্যবহার

(ঘ) প্রোটোজোয়া সৃষ্ট রোগ

ব্যাবেসিওসিস	ব্যাবেসিয়াগণ ভুক্ত আঁটুলি দ্বারা সৃষ্ট।	আক্রান্ত প্রাণির জ্বর, রক্তাল্পতা ও হেমোগ্লোবিনইউরিয়া দেখা যায়	আক্রান্ত প্রাণির সুষ্ঠু চিকিৎসা ও বাহক (আটুলি) নিয়ন্ত্রণ।

(ঙ) বহিঃদেহের পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট রোগসমূহ

(১)উকুন রোগ বা পেডিকুলোসিস	উকুন দ্বারা সৃষ্ট হয়	অল্প আক্রমণে তেমন লক্ষণ বোঝা যায় না তবে মাঝারি প্রকৃতিতে দীর্ঘমেয়াদী চর্ম প্রদাহ হয়। চুলকানি, ক্ষুধামন্দা, দুর্বলতা, ওজন হ্রাস ও বাছুরের লোম পড়ে যায়।	প্রাণির দেহ ব্রাশ করা, গোসল করানো, উকুন হাত দিয়ে মেরে ফেলা ও গোয়াল ঘরে ধোঁয়া দেয়া।

(২) আঁটুলির আক্রমণ	আঁটুলি	অ্যানিমিয়া, অস্বস্তি বোধ, খাদ্য গ্রহণ হ্রাস, দৈহিক ওজন ও দুধ উৎপাদন কমে যায়। চুলকানি, রক্ত জমাট বাঁধা দাগ দেখা যায়, আঁটুলি বিভিন্ন রোগের বাহক হয়।	প্রাণির দেহ ব্রাশ ও গোসল করানো, আঁটুলি ধরে মেরে ফেলা ও গোয়াল ঘরে ধোঁয়া দেওয়া।
(৩) মেঞ্জ	মাইটের আক্রমণ দ্বারা সৃষ্ট	চর্ম প্রদাহ, চুলকানি, লোম পড়া, খাদ্য গ্রহণ কমে যাওয়া, দুর্বল,স্বাস্থ্যহানী, চামড়া নষ্ট হয় ও পুঁজ সৃষ্টি হয়।	ঐ

২। অপুষ্টি ও বিপাকীয় রোগসমূহ

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	প্রতিকার
(ক) দুগ্ধ জ্বর	রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে যাওয়া।	ক্ষুধামন্দা, উত্তেজিত ভাব, মাথা ও পা কাঁপা, দাঁড়িয়ে থাকা, হাঁটতে গেলে টলতে থাকা, পিছনের পায়ের দুর্বলতার কারণে শুয়ে পড়া। পা গুলো ছড়াতে থাকে যা থলথলে ও দুর্বল দেখায়।	ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড খাওয়ানো, দানাদার খাদ্যের সাথে ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম খাওয়ানো।
(খ)কিটোসিস	গর্ভবতী গাভীর শর্করা খাদ্যের ত্রুটিপূর্ণ বিপাকের কারণে সৃষ্ট বিপাকীয় রোগ। রক্তে গ্লুকোজের অভাব, খাদ্যে শর্করা জাতীয় খাদ্যের অভাবে এ রোগ হয়।	ক্ষুধামন্দা, দুধ উৎপাদন কম, দানাদার খাদ্য খাওয়া বন্ধ করে কিন্তু খড় খেতে থাকে। খাদ্য গ্রহণে অনিহা, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, গাভীর শ্বাস-প্রশ্বাস, প্রস্রাব ও গোয়াল ঘরে অ্যালকোহলিক গন্ধ থাকে। সবকিছু অহেতুক চাটতে থাকে, টলমল করে। দাঁড়াতে পারে না, দেহে কাঁপুনি ও খিচুনি থাকে।	গ্লুকোজ বা ডেক্সট্রোজ ইনজেকশন দিয়ে প্রতিরোধ করা যায়।

৩। বিষক্রিয়া

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	প্রতিকার
নাইট্রেট ও নাইট্রাইট বিষক্রিয়া	শ্যামা, হেলেঞ্চা, বোরা ইত্যাদি নাইট্রেট যুক্ত ঘাস খেয়ে। ভূট্টা গেইচা, মূলা, সরিষাতে ৩% এবং নেপিয়ারে ৯.৮% নাইট্রেট থাকে বিধায় এসব ঘাস খাওয়ানো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।	লালাক্ষরণ, ডায়রিয়া ও শ্বাসকষ্ট দেখা যায়, পেশীর কম্পন, দুর্বলতা, টলমল অবস্থা ও পরে মাটিতে শুয়ে পড়ে ও খিচুনি হয়।	১% এর অধিক নাইট্রেট যুক্ত ঘাস প্রাণিকে না খাওয়ানো ও কাঁচা ঘাসের সাথে খড় মিশিয়ে খাওয়ানো।

২৫.৬ গবাদি প্রাণির বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদানের শিডিউল, টিকা সংরক্ষণ ও ব্যবহারবিধি

টিকা সংরক্ষণ

সঠিক পদ্ধতিতে টিকা সংরক্ষণ না করলে টিকার গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। টিকার বোতলের গায়ে বা অন্য কাগজে সংরক্ষণ নির্দেশনা লেখা থাকে। যে টিকা হিমু শুষ্ক অবস্থায় ভায়েলে থাকে সেগুলো শূন্য ডিগ্রির নিচের তাপমাত্রায় রেফ্রিজারেটরে বা ডিপফ্রিজে রাখতে হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকা ব্যবহার করা উচিত নয়। টিকা কোল্ড চেইন সিস্টেমের মাধ্যমে ল্যাবরেটরী/গবেষণাগার থেকে গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছে। এটি নিম্নরূপে ঘটে।

প্রাথমিক স্তর — মাধ্যমিক স্তর

গবেষণাগার (-২০° হতে ১৫°সে) —০° C→ **জেলা/উপজেলা** (০° C/ ৮°C) —০° C→ **ইউনিয়ন বা গ্রাম** (৮° -১৫° সেটিগ্রেড)

পরিবহনে ত্রুটি হলে টিকা বীজের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। কোল্ড চেইন এর উপাদান যেমন মানুষ, যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল। কোল্ড চেইন সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেমন কোল্ড রুম, ফ্রিজার রুম, রেফ্রিজারেটর রুম, ডিপ ফ্রিজার, আইস প্যাক ফ্রিজার, কোল্ড বক্স, ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার, আইস প্যাক, রেফ্রিজারেট ও ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি। টিকা শীতল করে জেলা সদরে সরবরাহ করে শীতল কক্ষে বা ছোট ছোট ফ্লাস্কে বরফ দিয়ে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। টিকা প্রয়োগের সময়সীমা পর্যন্ত টিকার শীতলতা বজায় রাখতে হয়। নতুবা টিকার গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

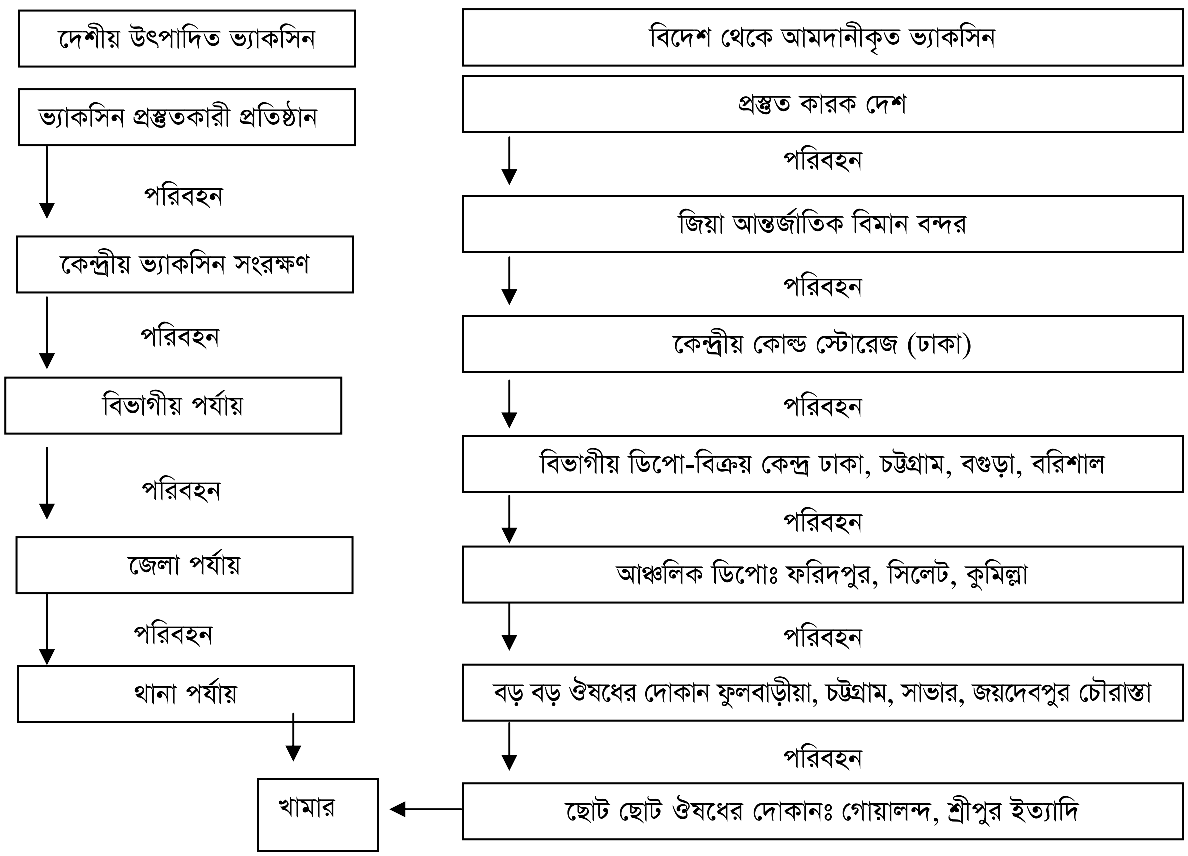

চিত্র ঃ কোল্ড চেইনের ধাপ

টিকার সঠিক ব্যবহারের জন্য বিবেচ্য বিষয়

১। যথাযথ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা ।

২। ভ্যাকসিনের শিশি বা ভায়াল কখনোই সরাসরি সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসবে না।

৩। সকালে অথবা সন্ধ্যায় যখন সূর্যের আলোর তীব্রতা কম থাকে তখনই টিকা প্রদান কর্মসূচি শুরু করতে হবে।

৪। সূর্যের আলোর সংস্পর্শে এড়িয়ে প্রস্তুতকারক কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ মতো টিকা তৈরি করতে হবে।

৫। টিকা গোলানোর পর অতিদ্রুত ছায়াযুক্ত স্থানে বসে টিকা সঠিক পদ্ধতিতে ও সঠিক মাত্রায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে প্রয়োগ করা উচিত।

৬। অসুস্থ গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগিকে কখনোই টিকা প্রদান করা উচিত নয়।

৭। শীতকালে ভ্যাকসিন তৈরির ২ ঘন্টার ও গরম কালে ১ ঘন্টার ভিতর প্রয়োগ করতে হয়। টিকা প্রদানের বিলম্ব হলে গোলানো টিকার পাত্রের পাশে কিছুক্ষণ পর পর ঠান্ডা পানি অথবা বরফের টুকরা রাখতে হবে।

সারণী ২৫.১ গবাদি প্রাণির বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদানের শিডিউল

টিকার নাম	মাত্রা	কতদিন পর পর	কোন বয়সে	প্রয়োগ	সংরক্ষণ তাপমাত্রা
১	২	৩	৪	৫	৬
তড়কা	গরু/মহিষ/ ঘোড়া ১ সিসি	১ বছর	৪ মাস	ত্বকের নিচে	৪° সে.
বাদলা	বাছুর ৫ সিসি, ভেড়া/ছাগল ২ সিসি	৬ মাস	৪ মাস	ত্বকের নিচে	৪-৮° সে.
ক্ষুরারোগ ক)মনোভ্যালেন্ট খ) বাই ভ্যালেট	 ৩২ মাত্রা ভায়েল ১৬ মাত্রা ভায়েল	৪ মাস	৪ মাস	ত্বকের নিচে	৪-৮° সে.
গলাফুলা	গরু ও মহিষ ২ সিসি	১ বছর	৬ মাস	ত্বকের নিচে	২-৪° সে.
রিল্ডারপেস্ট	গরু ও মহিষ ১ সিসি	কয়েক বছর	প্রতি বছর	ত্বকের নিচে	৪-৮° সে.
জলাতঙ্ক	কুকুর ৩ সিসি; গরু, মহিষ, বানর-৬ সিসি; বিড়াল-১.৫ সিসি	১ বছর		মাংসে	-২০° সে.
অ্যান্টি র‍্যাবিস	ক) কুকুর/বিড়াল (৩০ পাঃ ওজন)-৫ সিসি/দিন-৭ দিন খ) কুকুর/বাছুর/ভেড়া/ছাগল-১০ সিসি/দিন-৭ দিন গ) ঘোড়া/গাভী/মহিষ-৩০ সিসি/দিন ১৪ দিন ঘ) বকনা/গাধা-২০ সিসি/দিন-১৪ দিন ঙ) হাতি/উট-৬০ সিসি/দিন-১৪ দিন	১ বছর (১ মাস পর বুষ্টার ডোজ)		মাংসে	-২০° সে.

উৎসঃ
*গাভী পালন গাইড - এ. টি. এম. ফজলুল কাদের
*প্রাণি পালন - কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
*প্রাণি সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা - ১২১২

মডিউল-২৬ ঃ
গবাদি প্রাণির মলমূত্র ও বর্জ্য হতে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

বায়োগ্যাস কি?

গোবর ও অন্যান্য পচনশীল পদার্থ বাতাসের অনুপস্থিতিতে পঁচানোর ফলে যে রং বিহীন জ্বালানি গ্যাস তৈরি হয় তাকে বায়োগ্যাস বলা হয়। এতে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ মিথেন থাকে যা জ্বালানি গ্যাস হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বাকীটা মূলতঃ কার্বন-ডাই-অক্সাইড। গ্যাস উৎপাদনের পর যা অবশিষ্ট থাকে (বায়োগ্যাস রেসিডিউ) তা উন্নতমানের জৈব সার।

বায়োগ্যাস কেন?

সাধারণত গোবর, আবর্জনা ও অন্যান্য পঁচনশীল পদার্থকে শুকিয়ে জ্বালানি রূপে ব্যবহার করা হয়। এতে কাপড়-চোপড়, হাঁড়ি-পাতিল ও অন্যান্য আসবাবপত্র ময়লা হয় এবং রান্না-বান্নায় প্রচুর সময় নষ্ট হয়। উপরোক্ত পদার্থগুলো থেকে যে মূল্যবান সার কৃষি কাজে ব্যবহার করার জন্য পাওয়া যেত, তা পোড়ানোর ফলে নষ্ট হয়ে যায়। এ সমস্ত পদার্থকেই বায়োগ্যাস প্লান্টে পঁচিয়ে গ্যাস পাওয়া যায় এবং এটাকে সহজেই জ্বালানি রূপে ব্যবহার করা যায়। বায়োগ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের ফলে হাঁড়ি-পাতিল, কাপড়-চোপড় ও আসবাবপত্র ময়লা হয় না এবং রান্না-বান্নার সময় ও শ্রম কম লাগে। রাতে বাতি জ্বালাবার জন্য কেরোসিনের দরকার হয় না, ম্যান্টল জ্বালিয়ে হ্যাজাক লাইটের মত আলো পাওয়া যায়। উপরন্তু গ্যাস উৎপাদনের পর প্লান্ট থেকে বেরিয়ে আসা পদার্থকে ভাল সার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

স্থিরডোম মডেলের সুবিধা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাধারণত দুই মডেলের প্লান্ট চালু আছে। যথাঃ ভাসমান ডোম মডেল। ভাসমান ডোম মডেলে এম এস সীটের তৈরি গ্যাস হোল্ডার দরকার হয় বিধায় খরচ বেশি এবং ক্ষয়জনিত কারণে স্থায়ীত্বকাল কম। কিন্তু স্থিরডোম মডলে কোন মেটালের দরকার পড়ে না। শুধু ইট, বালি এবং সিমেন্ট দিয়ে এই প্লান্ট নির্মাণ করা যায়। ফলে, খরচ হয় কম, তদুপরি দীর্ঘস্থায়ী। একবার লিকমুক্ত ভাবে তৈরি করা গেলেই তা নির্বিঘ্নে কমপক্ষে ৩০ বছর চালু থাকে। বায়োগ্যাস পাইলোট প্লান্ট প্রকল্প জ্বালানি গবেষনা ও উন্নয়ন ইন্‌ষ্টিটিউটে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৯১ সনে দেশোপযোগী স্থির ডোম মডেল প্লান্ট স্থাপন করে।

বায়োগ্যাস প্লান্টের স্থান নির্বাচন

বায়োগ্যাস প্লান্ট সাধারণত দুর্ঘটনামুক্ত এবং এই প্লান্টে দুর্গন্ধ বা মশ-মাছির উপদ্রবের সম্ভাবনা না থাকায় এটা রান্না ঘরের কাছেই বানানো যেতে পারে। অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এর খুব নিকটে বড় গাছ না থাকে, কারণ গাছের শিকড় প্লান্টের দেয়ালে ফাটল সৃষ্টি করতে পারে। বড় গর্ত, নদী বা খাল ইত্যাদির সন্নিকটের প্লান্ট স্থাপন সঙ্গত হবে না।

বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরির জন্য প্রথমেই যা আবশ্যক

বায়োগ্যাস প্লান্ট বানাতে ইচ্ছুক ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠানের গরু/মহিষ/হাঁস-মুরগী ইত্যাদি থাকতে হবে। ৭/৮ জন লোকের দৈনিক রান্নাবান্না ও বাতি জ্বালানোর জন্য ৫/৬টি বড় গরুর গোবর প্রয়োজন। মানুষের মল মূত্র ও গ্যাস উৎপাদনের জন্য বায়োগ্যাস প্লান্টে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭/৮ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য ১০৫ (৩ঘনমিটার) ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনোক্ষম স্থিরডোম বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ পদ্ধতি।

ডাইজেষ্টার তৈরি পদ্ধতি

২৬০ সেমি ব্যাস এবং ২২১ সেমি গভীর একটি গোলাকার কুয়া খনন করতে হবে। কুয়ার তলদেশ চাড়ির তলার আকৃতিতে খনন করতে হবে যাতে চাড়ির তলার মধ্য বিন্দু থেকে আর্চের উচ্চতা ৩০ সেমি (১ ফুট) হয় (চিত্র নং ২৬.১)। এরপর তলদেশে ভাল করে দুরমুজ করে নিতে হবে। তলদেশে ৭.৫ সেমি পুরু ইট বিছিয়ে দিতে হবে। এই

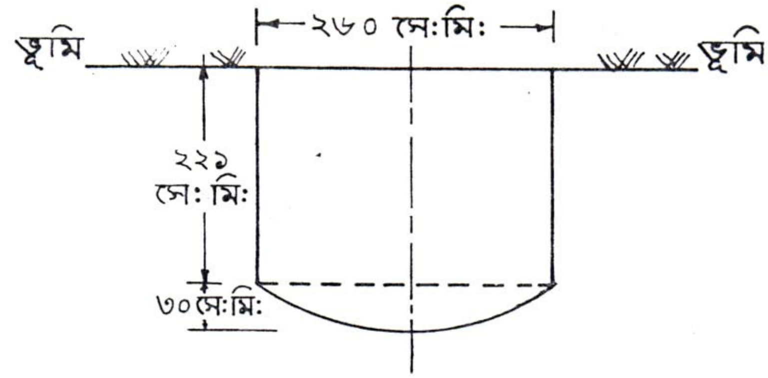

চিত্র ২৬.১

সোলিং এর উপরে ১ঃ ৩ঃ ৬ (সিমেন্ট ঃ বালু ঃ খোয়া) অনুপাতে ৭.৫ সেমি পুরু ঢালাই দিতে হবে। ঢালাই এর উপরে ২২১ সেমি ব্যাস (ভিতরে) রেখে গোলাকৃতি ১২.৫ সেমি ইটের দেয়ালের গাঁথুনি শুরু করতে হবে। দেয়ালের উচ্চতা যখন ১৫ সেমি হবে তখন কুয়ার একদিকে আউটলেট ডোর এর জন্য ৯১ সেমি×৯১ সেমি এবং অন্যদিকে (আউটলেট ডোর ৯০° কোনে) ইনলেট পাইপ বসানোর জন্য ২০ সেমি×২৫ সেমি গাঁথুনি খোলা রাখতে হবে (চিত্র নং২৬.২)। ১৫ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট, একটি আরসিসি/পিভিসি পাইপ (ইনলেট পাইপ) দেয়ালের সঙ্গে

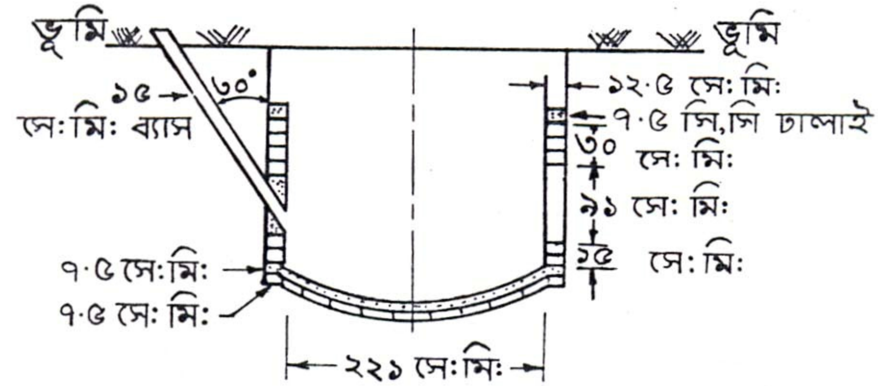

চিত্র ২৬.২

আনুমানিক ৩০° কোণ রেখে বসিয়ে নিতে হবে। দেয়ালের কাজ মোট ১০৬ সেমি হলে আউটলেট ডোম এর কাজ শেষ হবে। দেয়ালের কাজ পুনরায় শুরু করে আউটলেট ডোর এর উপরিভাগ থেকে ৩০ সেমি পর্যন্ত গেঁথে নিতে হবে। এখন দেয়ালের উপরিভাগে ১ঃ ২ঃ ৪ অনুপাতে ৭.৫ সেমি পুরু ঢালাই দিতে হবে। এই ঢালাই এর উপর ৭.৫ সেমি পুরু ইটের গাঁথনি দিয়ে ৪৫ সেমি আর্চ উচ্চতা (ভিতরে) বিশিষ্ট গম্বুজ আকৃতির ডোম তৈরি করতে হবে (চিত্র নং ২৬.৩)।

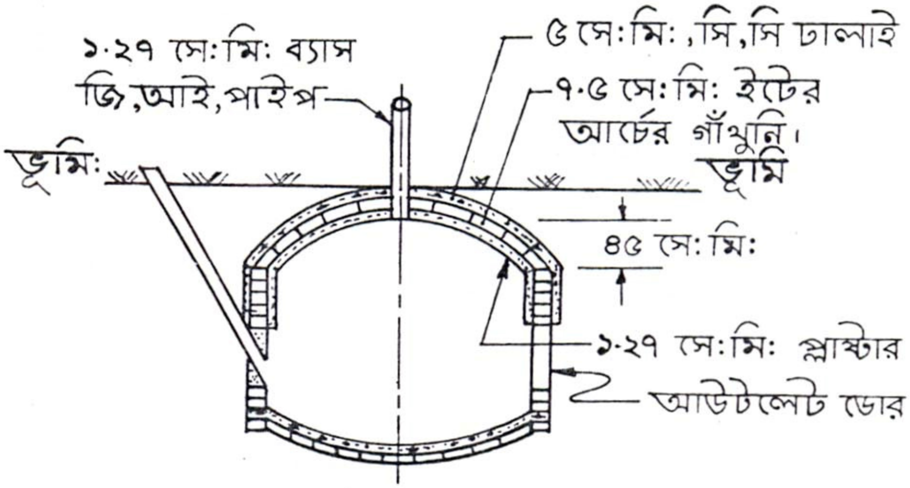

চিত্র ২৬.৩

ডোমর উপরের অংশে গ্যাস নির্গমনের জন্য একটি ১.২৭ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট ২৫ সেমি লম্বা জিআই পাইপ খাড়াভাবে স্থাপন করতে হবে। জিআই পাইপের উপরি অংশে একটি গ্যাস ভাল্ব সংযুক্ত করতে হবে। এখন দেয়ালের ভিতরের অংশে নিচ থেকে আউটলেট ডোর এর উপরিভাগ পর্যন্ত ১ঃ ৪ অনুপাতে ১.২৭ সেমি পুরু প্লাষ্টার করতে হবে। আউটলেট ডোর এর উপরিভাগ থেকে ডোমের ভিতরের সম্পূর্ণ অংশ (গ্যাস চেম্বার) ১ঃ৩, ১ঃ২, ১ঃ১ অনুপাতে তিনবার প্লাষ্টার করতে হবে। প্রতিবার প্লাষ্টারিং এর পূর্বে সিমেন্ট পেষ্ট করে ব্রাস করে নিতে হবে। ৫/৬ দিন কিউরিং করার পর ভিতরের ডোম সহ আউটলেট ডোর পর্যন্ত দেয়ালের শুকনা অবস্থায় ১ মিমি পুরু মোম/সিলিকেট প্রলেপ দিতে হবে। ডোমের উপরের সম্পূর্ণ অংশ এবং আউটলেট ডোরের উপর থেকে গ্যাস চেম্বারের বাইরের অংশ ৫ সেমি সিসি ঢালাই এর পর নিট ফিনিশিং করে নিতে হবে।

হাইড্রলিক চেম্বার

১২.৫ সেমি ইটের গাঁথুনি দিয়ে ৭৬ সেমি দৈর্ঘ্য×৯১ সেমি প্রস্থ ×১২৯ সেমি উচ্চতা মাপের একটি আউটলেট প্যাসেজ এবং আউটলেট প্যাসেজের উপরে ২১৩ সেমি দৈর্ঘ্য×১৫২ সেমি প্রস্থ ×৪৫ সেমি উচ্চতা মাপের আয়তকার একটি হাইড্রলিক চেম্বার তৈরি করতে হবে (চিত্র নং২৬.৪ ও ২৬.৫)। ৪৫ সেমি দেয়ালের কাজ শেষ হলে

স্পেন্ট স্লারী নির্গমনের জন্য একদিকে একটা ওভারফ্লো পাইপ বসাতে হবে অথবা খোলা পথ/দরজা রাখতে হবে

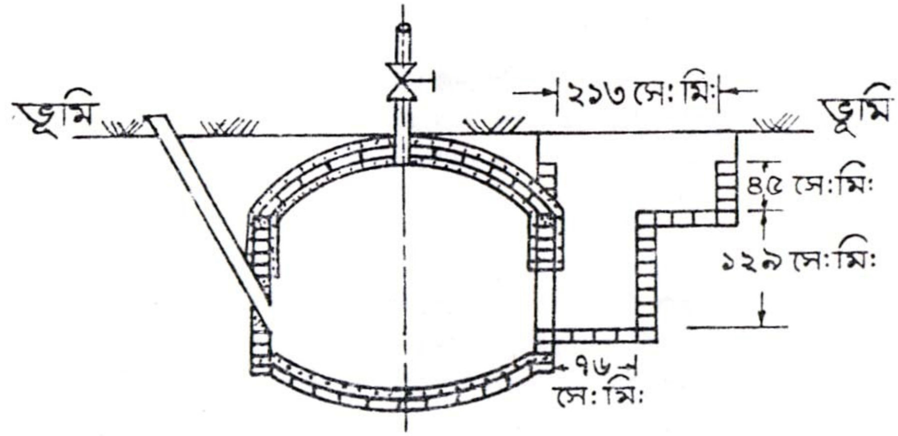

চিত্র ২৬.৪

(চিত্র নং২৬. ৫)। হাইড্রলিক চেম্বারের ভিতরের দিক ১ঃ৪ অনুপাতে প্লাষ্টার করে নিতে হবে। স্পেন্ট স্লারী নির্গমনের পথের উপরে আরো ৭.৫ সেমি গেঁথে নিতে হবে। হাইড্রলিক চেম্বারের উপরের অংশ ঢেকে রাখার জন্য স্বাব/টিনের ঢাকনি ব্যবহার করতে হবে।

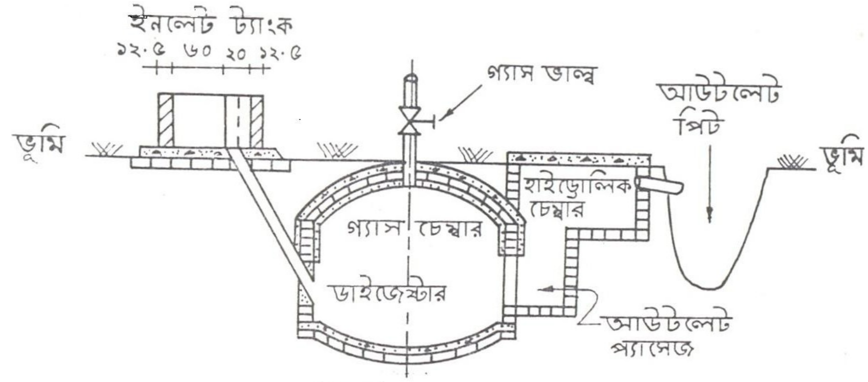

ছেদক ক ও খ

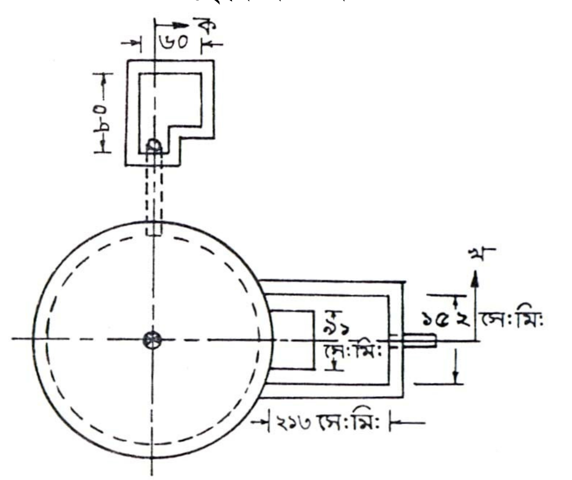

চিত্র ২৬. ৫

ইনলেট ট্যাংক

ইনলেট পাইপের মুখে ৬০ সেমি×৬০ সেমি×৬০ সেমি মাপে একটি ১২.৫ সেমি পুরু ইটের ট্যাংক তৈরি করতে হবে। এই ট্যাংক এর বাইরের এবং ভিতরের অংশ ভালোভাবে প্লাষ্টার করতে হবে।

ডাইজেষ্টার, হাইড্রলিক চেম্বার এবং ইনলেট ট্যাংক তৈরির পর প্লান্টের চারপাশে বালি ও মাটি দিয়ে এমনভাবে ভরাট করতে হবে যেন ডোমের উপরিভাগ পর্যন্ত মাটির নিচে থাকে।

প্লান্ট চালু করার নিয়মাবলী

প্লান্ট চালু করার সময় ১.৫-২ টন কাঁচামাল যথা গোবর, হাঁস-মুরগীর মল, মানুষের মল জাতীয় পচঁনশীল পদার্থের প্রয়োজন। প্লান্ট তৈরির শুরু থেকে এগুলো জমা করে রাখলে প্লান্ট চালুর সময় এগুলো ব্যবহার করা যাবে। অবশ্য কেউ যদি ২/১ দিনেই উক্ত পরিমাণ কাঁচামাল যোগাড় করতে পারেন, তবে আগে থেকে জমা করে রাখার প্রয়োজন নেই। জমাকৃত কাঁচামাল এবং পরিষ্কার পানি গোবরের ক্ষেত্রে ১ঃ১, হাঁস-মুরগীর মলের ক্ষেত্রে ১ঃ২ অনুপাতে মিশিয়ে ইনলেট পাইপ দিয়ে আস্তে আস্তে ডাইজেষ্টারে ঢালতে হবে। কাঁচামাল ও পানির মিশ্রণ (স্লারী) এই পরিমাণ প্লান্টের মধ্যেঢালতে হবে যাতে করে স্লারীর লেভেল হাইড্রোলিক চেম্বারের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছায় ।

চার্জিং এর সময় খেয়াল রাখতে হবে মাটির ঢাকা, পাথর, বালি, বড় সাইজের খড়কুটা ইত্যাদি যেন কুয়ার ভিতর প্রবেশ না করে।

প্লান্ট এবং গ্যাস ভাল্বের ছিদ্র পরীক্ষা

গ্যাস ভাল্বের ছিদ্র পরীক্ষার জন্য পলিথিন পাইপের একমাথা গ্যাস ভাল্বে এবং অন্য মাথা পানির মধ্যে সামান্য ডুবিয়ে দিতে হবে, যদি ভাল্ব বন্ধ অবস্থায় পানিতে বুদবুদ তৈরি হয়, তবে বুঝতে হবে ভাল্বের ভিতরে ছিদ্র আছে। ভাল্বের গোড়ায় সাবানের ফেনা লাগিয়ে যদি বৃদ বৃদ দেখা যায় তবে ধরে নিতে হবে ভাল্বের গোড়ায় গ্যাস লিক করছে। এমতাবস্থায় গ্রিজ ও থ্রেড টেপ/পাট জাতীয় কিছু দিয়ে ছিদ্র মুক্ত করতে হবে।

গ্যাস সরবরাহে নিয়ম

১.২৭-২.৫৪ সেমি ব্যাসের পিভিসি/জিআই পাইপ প্লান্ট থেকে চুলা/হ্যাজাক লাইট/জেনারেটর পর্যন্ত সংযোগ করতে হবে। যেহেতু বায়োগ্যাসে পানি মিশ্রিত থাকে, সেহেতু সরবরাহ লাইনে মাঝখানে উঁচু করে নিতে হবে। ফলে পাইপের মাঝখানে কোথাও পানি জমে থাকার সম্ভাবনা থাকবে না। পাইপের একমাথা একটি প্লাষ্টিক পাইপের সাহায্যে প্লান্টের সরবরাহ লাইনে এবং অন্য মাথাটি চুলা/হ্যাজাক লাইট/জেনারেটর ইত্যাদির সাথে টি এর সাহায্যে যুক্ত করে নিতে হবে।

বায়োগ্যাস প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ

বায়োগ্যাস প্লান্ট রক্ষণাবেক্ষণের তেমন কোন ঝামেলা নেই। তথাপি নিম্নলিখিত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম পালন করলে সুষ্ঠুভাবে গ্যাস উৎপাদনে সহায়ক হবেঃ

(১) চার্জিং এর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন ইট, পাথর বা কাঠের টুকরা ইত্যাদি প্লান্টে ঢুকতে না পারে। তা হলে ইনলেট পাইপ তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

(২) কোন সময় ইনলেট পাইপ বন্ধ হয়ে গেলে একটি সোজা ও সরু বাঁশ দিয়ে সাবধানে পাইপের ভিতর নেড়ে দিতে হবে। তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এতে কুয়ার তলায় বা পাইপের গায়ে জোরে আঘাত না লাগে।

(৩) গ্যাস পাইপ লাইনে পানি জমেছে কিনা দেখে নিতে হবে। পানি জমলে যে মাথায় পানি জমেছে সে মাথা খুলে পানি বের করে দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে পানির ট্র্যাপ ব্যবহার করতে হবে।

(৪) প্লান্টে প্রতিদিন চার্জ করতে হবে নতুবা গ্যাস উৎপাদন কমে যাবে। বেশ কিছু দিন চার্জ না করা হলে ইনলেট পাইপ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

বায়োগ্যাসের ব্যবহার

- তিতাস গ্যাসের মতই এই গ্যাস দিয়ে রান্না করা যায়।
- ম্যান্টল জ্বেলে হ্যাজাক লাইটের মত আলো পাওয়া যায়।
- জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে ফ্যান, রেডিও, টেলিভিশন, ভিসিপি ইত্যাদি চালানো যায় এবং বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বালানো যায়।
- পাম্পের সাহায্যে জমিতে পানি সেচ করা যায়।
- এই গ্যাস দিয়ে গাড়ী চালানো যায়।
- এই গ্যাস ব্যবহার করে ফলমূল, খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করা যায়।
- এই গ্যাস দ্বারা ইনকিউরেটর চালানো যায়।

বায়োগ্যাস রেসিডিউ এর ব্যবহার

- উন্নতমানের জৈব সার
- মাশরুম চাষ
- মাছের চাষ
- মুক্তো চাষ
- কেঁচো চাষ (হাঁস, মুরগী ও মাছের খাদ্য)
- বীজ অংকুরোদগম।

স্বাস্থ্যগত সুবিধাদি

বায়োগ্যাস প্রযুক্তির আর একটি বিশেষ দিক হল স্বাস্থ্যগত সুবিধা। আবর্জনাই হোক অথবা মানুষ বা প্রাণি-পাখীর মল-মূত্রই হোক, যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকলে দুর্গন্ধ ছড়ায়, মশা-মাছি আকৃষ্ট করে, রোগ-জীবাণু বিস্তারে সহায়তা করে। বায়োগ্যাস প্লান্টে এ সব দ্রব্য পঁচনের ফলে দুর্গন্ধ ছড়ায় না, মশা-মাছি আকৃষ্ট হয় না এবং রোগ-জীবাণু বহুলাংশে ধ্বংস হয়ে যায়।

উৎপাদন বৃদ্ধিতে বায়োগ্যাস রেসিডিউ

বায়োগ্যাস প্রযুক্তির আরও একটি সুফল হল জৈব সার হিসেবে এর ব্যবহার। গ্যাস নির্গত হওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে (বায়োগ্যাস রেসিডিউ) তা একটি উন্নতমানের জৈব সার। এই সারে জৈব পদার্থ, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সংরক্ষিত হয়, ফলে সারের মান উন্নত হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

সারণী ২৬.১ কম্পোষ্ট সারের তুলনায় বায়োগ্যাস প্লান্ট থেকে প্রাপ্ত সারের উৎকৃষ্টতা

সার	ধান	গম	ভুট্টা	তুলা
সাধারণ জৈব সার	১০০	১০০	১০০	১০০
বায়োগ্যাস রেসিডিউ	১১০	১১২.৫	১২৮	১২৪.৭

সারণী ২৬.২ রাসয়নিক সারের তুলনায় বায়োগ্যাস প্লান্ট থেকে প্রাপ্ত সারের উৎকৃষ্টতা

ফসলের নাম	রাসায়নিক সারে ফসল উৎপাদন (টন/হেক্টর)	বায়োগ্যাস রেসিডিউতে ফসল উৎপাদন (টন/হেক্টর)	শতকরা বৃদ্ধির হার
ধান	৮.২৮	৯.০২	৮.৯৩
ভুট্টা	৭.০	৯.৫	৩৫.৭
তুলা	৩.১৩	৩.৯৭	২৬.৮
শাকসবজি	কম	বেশি	

উৎসঃ

*স্থির ডোম বায়োগ্যাস প্লান্ট - বায়োগ্যাস পাইলোট প্লান্ট প্রকল্প, জ্বালানি গবেষণা ও উন্নয়ন ইন্সটিটিউট

*গাভী পালন গাইড - এ. টি. এম. ফজলুল কাদের